

ইসলামী উপন্যাস



পরিবর্তন

(নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)



শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর



প্রিন্টিং ও বাঁধাই
মুসলিম প্রিন্টার্স
দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।
মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

মূল্যঃ ৬০ টাকা।

১.

ব্যাগ হাতে ছোটমামাকে দেখে প্রায় চাঁদ হাতে পেয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয় মিরাজের। আগে প্রায় তাদের বাড়ি বেড়াতে আসতেন ছোটমামা। গত দুই বছরের মধ্যে এক বারও আসেননি তিনি। মামা আসলে খুব মজা হয় মিরাজের। মামার কাধে ওঠা, তার সাথে বাজারে যাওয়া, নদীতে যেয়ে মামার হাতের উপর ভেসে সাতার কাটা মামার সাথে আরও কত রকম দুষ্টমি করে সে। মামাও তাকে খুব ভালবাসেন। যেদিন হেচকা টান দিয়ে মামার মাথা থেকে একমুঠো চুল উপড়িয়ে ফেলে ছিল সেদিনও তাকে কিছুই বলননি তিনি। বাবা হলে তাকে নিশ্চয় বাড়ি ছাড়া করতেন।

এই বুঝি আমাদের কথা মনে পড়ল। ব্যাগটি মামার হাত থেকে নিতে নিতে বললেন মিরাজের মা।

ততক্ষনে মিরাজ হাজির হয়ে যায়। মামা তাকে কোলে তুলে নেন। মিরাজ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মায়ের হাতের ব্যাগটির দিকে। নিশ্চয় মজার কিছু নিয়ে এসেছেন ছোটমামা।

মিরাজের তাকান দেখে ব্যাগটি খোলেন তার মা। মিরাজের মায়ের নাম রায়হানা বেগম। সবাই তাকে রেনু বলে ডাকে। মিরাজ জানতোই না তার মায় নাম রেনু। যেদিন প্রথম ছোটমামাকে রেনু আপু বলে ডাকতে শোনে কেবল সেদিনই জানতে পারে সে।

নে ধর। একটি মোটা আপেল বের করে মিরাজের দিকে এগিয়ে দেন রায়হানা বেগম।

কিন্তু সেদিকে হাত বাড়ায় না মিরাজ। মায়ের দেওয়া আপেল সে নেবে না। নিজ হাতে ব্যাগ হতে পছন্দ মত আপেল না নিলে তার মন ভরবে না। ব্যাপারটি বুঝতে পারেন তার মা। ব্যাগটি মেঝের উপর রাখতে রাখতে বললেন।

নে। নিয়ে যা এখান থেকে।

মামার কোল হতে তাড়াতাড়ি নেমে ব্যাগটির দিকে দৌড়িয়ে আসে মিরাজ। আপেলগুলো উল্টে পাল্টে পছন্দ করতে থাকে। লাল টসটসে একটা মোটা আপেল হাতের মুঠের মধ্যে নেয়। ডান হাতে আপেলটিকে শক্ত করে ধরে বড় ভায়ের পড়ার ঘরের দিকে চলে যায় সে। তার বড় ভায়ের নাম মেহেদী। মেহেদী একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। সে এখন কলেজে। এদিক ওদিক খুজে কোথা হতে একটি চাকু বের করে ফেলে মিরাজ। শুধু আপেল নয় যে কোন ফল চাকু দিয়ে কেটে না খেলে কোন মজাই হয় না তার। কিন্তু ওর হাতে চাকু দেখলেই মা বকেন। ভাইয়া দেখলে তো কষে একটা থাপ্পরই মেরে দেবে। চাকুটি মাথার ভিতর লুকিয়ে সবার চোখ ফাকি দিয়ে ছাদের উপর চলে যায় সে। একটা সাদা কাগজের উপর রেখে চাকু দিয়ে দুখন্ড করে ফেলে আপেলটি। উপর থেকে যত ভাল মনে হচ্ছিল ভিতরে তত ভাল নয় আপেলটি। দুভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আঙ্গুলের মত মোটা একটা পোকা বের হয়ে আসে। মিরাজ আপেল খুব পছন্দ করে কিন্তু এই আপেলটিতে পোকা রয়েছে। সে এই আপেলটি খাবে না।

ছোটমামা তাহলে পোকায় খাওয়া আপেল নিয়ে এসেছে। মামার উপর খুব রাগ হয় মিরাজের।

মেঝের উপর বিছানা পেতে ভাইকে বসতে দিয়েছে মিরাজের মা। আশপাশ হতে কয়েকজন প্রতিবেশীও এসেছে মামাকে দেখতে। মিরাজ ছাদ থেকে আস্তে আস্তে নেমে আসে। হাতের আপেলটি সবাইকে দেখাতে দেখাতে মামার আপেল পোকায় খাওয়া। মামার আপেল পোকায় খাওয়া। কথাটি বানরের মত লাফাতে লাফাতে বার বার বলতে থাকে সে।

তার কান্ড দেখে হেসে দেয় উপস্থিত সবাই। ছোটমামা কেবল বিব্রত বোধ করেন।

জোহরের আযানের কিছুক্ষণ পর মেহেদী কলেজ থেকে ফিরে আসে। ছোটমামাকে দেখেই সালাম দেয়। মামা সালামের উত্তর না দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে।

তাকে শেষ দেখেছেন সেই দু'বছর আগে। কি অসম্ভব ডানপিটে ছিল তখন। চুন থেকে পান খসলেই তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে ফেলত বাড়িতে। কথার সামান্য বিপরীতে গেলেই নির্দয় ভাবে পেটাত ছোটভাইকে। তার কোন জিনিসই ব্যাবহার করার অনুমতি ছিলনা মিরাজের। একবার তার অনুপস্থিতিতে তার ফুটবলটি নিয়ে খেলতে থাকে মিরাজ। খেলতে খেলতে মাথায় পাগলামী চেপে বসে তার। বই সেলাই করা ভোমরটি দিয়ে সজরে একটি গুতো মেরে দেয় বলটির গায়ে। সাথে সাথেই কাগজের মত চুপসে যায় ফুটবলটি। মেহেদী বাড়ি ফিরে দেখে ফুটবলটি টুপি বানিয়ে মাথার উপর দিয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে মিরাজ। একটা কাচা কঞ্চি দিয়ে মিরাজের পিঠের উপর সজরে ৫/৭ টি আঘাত করে সে। আজও ভাল করে দেখলে সেই আঘাতের দাগ দেখা যায়। সেই থেকে বড় ভাইকে জমের মত ভয় করে মিরাজ।

মেহেদীর সমবয়সী ছেলেরাও তাকে বাঘের মত ভয় করত। সব সময় একটা চাকু নিয়ে ঘুরে বেরাত সে। কারও সাথে গন্ডগোল হলেই চাকু দিয়ে শাসিয়ে দিত। একবার তে চাকু দিয়ে মেরেই দেয় তার চাচাত ভাই শামীমকে। শামীম তার থেকে ২/৩ বছরের বড়। সে যখন নবম শ্রেণীতে পড়ে তখন শামীম কলেজে পড়ত। হাই স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলত মেহেদীরা। হঠাৎ একদিন শামীম কয়েকজন সংগি সাথি নিয়ে মাঠটি দখল করে ক্রিকেট খেলতে শুরু করে। মেহেদী মাঠে আসার সংগে সংগে তাকে ঘিরে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে ফুটবলের ভক্ত বৃন্দ। মেহেদীও ফুটবল খেলতে ভালবাসে। খেলেও ভাল। মাঝ মাঠ থেকে বল টেনে নিয়ে যেয়ে গোলপোষ্টের মধ্যে এমন জরে ছুড়ে দেয় যে, গোলরক্ষী বলটি দেখতেই পায় না। কেবল অন্ধের মত হাতরাতে থাকে। জেলা ভিত্তিক আন্ত-স্কুল প্রতিযোগিতায় কতবার এমন কসরত দেখিয়েছে সে। মাঠভর্তি দর্শক তখন আনন্দে দু'হাত তুলে স্বাগত জানায় তাকে।

মেহেদী সবকিছু শুনে সরাসরি চলে যায় শামীমের কাছে। কিছুক্ষণ কথা কাটা কাটি হয় তাদের। হঠাৎ তাকে ধাক্কা মেরে দেয় শামীম। সঙ্গে সঙ্গেই চাকুটি বের করে তার কপালে বসিয়ে দেয় মেহেদী। শামীমের অন্যান্য সংগী সাথিরা মারতে আসে তাকে। কিন্তু চাকু নিয়ে তাদের দিকে ঘুরে দাড়াতেই রক্তাক্ত শামীমকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় তারা। পরে এ নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছিল কিন্তু মাঠে আর ক্রিকেট খেলতে আসেনি শামীমরা।

মেহেদী তখন সালাত পড়ত না। জুমআর সালাতের দিন মার সাথে প্রায়ই ঝগড়া হত তার। মা অন্যান্য সালাতের জন্য কিছু না বললেও জুমআর দিন সালাত না পড়লে খুব বকতেন মেহেদীকে। কোন কোন দিন মার কাছে পরাজিত হয়ে মসজিদ পর্যন্ত পৌছাত।

এখন অনেক পাল্টে গেছে মেহেদী। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়ে। পরিষ্কার সাদা টুপিটি কখনও খোলেনা মাথা থেকে। প্রথম যেদিন হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা বানিয়ে দেওয়ার জন্য আবদার করে, তার মা খুবই অবাক হন। তিনি তাকে বলেন

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ছ পড় কিন্তু লম্বা জামার কি দরকার?

মা তাকে না জানিয়েই তার জন্য চমৎকার একটি ফুলপ্যান্ট আর এক জোড়া দামী জামা কিনে আনেন। তা দেখে রাগে ফুসতে থাকে মেহেদী। রেগে গেলে তার মাথায় ঠিক থাকে না। চাকু দিয়ে ফেত ফেত করে ফেড়ে ফেলে দামী কাপড়গুলি। লম্বা জামা কিনে না দেওয়ার জন্য জিদ ধরেন তার বাবাও। কিন্তু মেহেদীও কম জেদি নয়। লম্বা জামা কিনতে শেষ

মেষ বাধ্য হন রহিম সাহেব। অল্প দামের কাপড় দিয়ে মাহদীকে একটি লম্বা জামা বানিয়ে দেন তিনি। মেহেদী এত কম দামের কাপড় পড়ত না কোনদিন। পছন্দ না হলে কাপড়ের ব্যাগ বাবা মার সামনেই টিন দিয়ে ফেলে দিত। কিন্তু এখন সে কম দামের লম্বা জামা পরে। এতেই সে সন্তুষ্ট।

যখন নিয়মিত সালাত পড়া শুরু করে তখনও মুখে দাড়ি গজায়নি। আস্তে আস্তে মুখ ভর্তি দাড়ি গজাতে থাকে। সে দাড়িকে বুক ভরা আনন্দ দিয়ে স্বাগত জানায় মেহেদী। তার বাবা অনেক বার তার মাকে দিয়ে দাড়ি কেটে ফেলতে বলেছেন। মেহেদীকে প্রায় ভয়ই পান তার বাবা। মেহেদী মাকে কেবল বলেছে

আমি যার আদেশে দাড়ি রেখেছি তার আদেশ ছাড়া তা কাটব না।

তাকে বেশি ঘাটান নি রায়হানা বেগম। ছেলেকে ভাল করেই চেনেন তিনি। সে যা পছন্দ করে তার বাইরে কোন কাজ তার দিয়ে কখনও আদায় করা যায় নি। তার সাথে কড়াকড়ি করলে সে আরও বেশি কড়াকড়ি করে। তার সাথে জিদ ধরে কখনও পারেনি তার বাবা মা। সে এখন এমন বেশে ঘুরে বেড়ায় যে, যে কেউ তাকে দেখলে মাদ্রাসার ছাত্র মনে করে। মসজিদে ইমাম সাহেব অনুপস্থিত থাকলে প্রায়ই তাকে সামনে ঠেলে দেওয়া হয়। এখন তার এগুলোই ভাল লাগে।

ছোটমামা বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মেহেদীর দিকে যেন তিনি গণনা করছেন কি কি পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে। নীরবতা ভেঙ্গে তিনি বলে ওঠেন

এ কি অবস্থা তোর। তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? এখনও কি এসব করার বয়স হয়েছে তোর।

চোখ মুখ লাল হয়ে যায় মেহেদীর। যেন তাকে চাকু দিয়ে খোঁচান হচ্ছে। সে মামার দিকে একবার মুখ তুলে তাকায়। ৭ ভাই বোনের মধ্যে ছোট হলেও বয়স কম নই তার। ৪৫ তো হবেই। মামার দাড়ি বিহিন চেহারাটি মেহেদীর কাছে অবিকল বানরের মতই মনে হতে থাকে। সে মামাকে বলে

তোমারও কি বয়স হয়নি মামা? কাটসাট কথা বলা খুব পুরনো অভ্যাস তার।

ছোটমামা মাথা নিচু করে ফেলেন। ছেলের বয়সের ভাগ্নের মুখ থেকে এরকম কথা শুনতে হবে বুঝতে পারেননি তিনি।

মেহেদী ঘরে চলে যায়।

আমার চাকুটি কই। উঁচু গলাই চিৎকার করে মেহেদী।

এই মিরাজ . . . . মিরাজ . . . . ছোটভাইকে ডাকতে থাকে সে।

বড় ভায়ের ডাক শুনে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হয় মিরাজ।

আমার চাকু নিয়েছিস? প্রশ্ন করে মেহেদী

মিরাজ চাকু নিয়েছিল। ছাদের উপর যেয়ে আপেল কেটেছিল সে। তারপর সেখানেই ফেলে রেখ এসেছে। চাকু নিতে তার ভাইয়া তাকে নিষেধ করেছে। ভাইয়াকে মিথ্যাও বলা যাবে না। তাহলে নিশ্চিত মারবে। অবস্থা বেগতিক দেখে চিৎকার করে কেঁদে ফেলে মিরাজ। ভাইয়াকে সে ভীষণ ভয় করে।

ওকে ওভাবে কাদতে দেখে খুব মায়া হয় মেহেদীর টেনে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বলে আমি না তোকে চাকু নিতে নিষেধ করেছি?

ভাইয়ার মুখের দিকে তাকায় না মিরাজ। কেবলই ফুফাতে থাকে।

বিকালে বাড়ি আসেন মেহেদীর বাবা। তার বাবার নাম আব্দুর রহিম। পরিচিত সবাই তাকে রহিম সাহেব বলে ডাকে। তিনি উঁচু পোস্টের সরকারী চাকুরী করেন।

আরে! মন্টু যে, ছোটমামাকে দেখেই বলে ওঠেন তিনি। ছোটমামার সাথে অনেক গভীর সম্পর্ক তার। রায়হানা বেগমকে বিয়ে করার আগে থেকেই দুজনের বন্ধুত্ব। বলতে গেলেই মন্টুর সূত্রেই রায়হানা বেগমের সাথে বিয়ে হয় তার। বয়সে তিনি মন্টুর বড় তার পরও তাদের মনের মিল কলেজ জীবন থেকেই তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সৃষ্টি করে দেয়।

মন্টুমামা উঠানের কাঁঠাল গাছটির নিচে চেয়ার পেতে বসে ছিলেন। দুলা ভাইকে দেখামাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন। কোলাকুলি করেন তারা দুজন। মেহেদীর বাবা হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নেন। রায়হানা বেগম ততক্ষনে উঠানে একটি বিছানা পেতে দিয়েছেন। মামা সেখানে বসে রয়েছেন। বিছানায় এসে বসেন রহিম সাহেব। রায়হানা বেগম ছোটভায়ের নিয়ে আনা আপেলের সাথে সাথে নিজের তৈরী এনে দিয়ে যান দুজনের সামনে। ভাই আসার পর থেকেই তার মনের মত খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত তিনি। খেতে খেতে দুলাভাই এর সাথে গল্প করতে থাকে মন্টু মামা। অনেকক্ষণ একাকী সময় কাটিয়েছেন তিনি।

মেহেদীর বাবার সাথে খুব জমে ছোটমামার। দুনিয়ার যত কথা আলোচনা করেন তারা। কিন্তু আজ কোন বিষয় আলোচনা জমছে না। ছোটমামার কেবলই মেহেদীর কথাটি মনে পড়ছে।

তোমার ছেলে দেখছি মাওলানা হয়ে গেছে। অনেকটা শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন মাহবুবুল আলম মন্টু। তার কথা শুনে মেহেদীর বাবা যেন অপমানিত বোধ করেন। মুখ লাল করে বলেন অনেক চেষ্টা করেও ফেরাতে পারলাম না ওকে। তুই এসেছিস তুই ভাল করে বুঝিয়ে শুনিয়ে দেখ ফেরান যায় কিনা। আশা নিয়ে প্রস্তাবটি পেশ করেন রহিম সাহেব।

ছোটমামা চুপ থাকেন। মেহেদীকে আর কিছু বলার সাহস নেই তার। প্রথম পর্বেই আলোচনার পথ বন্ধ করে দিয়েছে মেহেদী। শুধু বলেছে ওকে আর ফেরান যাবে না।

বাবা নিরব থাকেন যেন তিনি মেনে নিয়েছেন ছোটমামার কথা। তারা দুজন অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।

এশার সালাত পড়ে বেশ রাতে বাড়ি ফেরে মেহেদী। এটা তার প্রতিদিনের অভ্যাস। সালাত পড়ে যখন সবাই চলে যায়, পুরো খালি হয়ে যায় মসজিদটি তখন সে একা বসে থাকে। মসজিদের খাদিম সাহেব তার জন্য দরজা খুলে রেখে চলে যান। ওকে খুব ভালবাসেন খাদেম সাহেব। ওরকম ছেলে কোনদিন দেখেননি তিনি। তার মুখ দেখেই মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। খাদিম সাহেব মাঝে মাঝেই এর ওর কাছে গল্প করেন ওকে নিয়ে।

আমি অনেক পীরের কাছে গেছি। তাদের কাউকে এত খাটি, এত নির্ভেজাল মনে হয়নি আমার। তারা ব্যাবসা করে। তারা আল্লাহর দ্বীন বেচে টাকা কামায় করে।

যখন সবাই চলে যায়। মেহেদী একাকি একটা কোরআন শরীফ নিয়ে বসে। করুন কণ্ঠে কোরআন তেলওয়াত করে। মাদ্রাসাতে পড়েনি কিন্তু আরবী ভাষায় অনেক জ্ঞান তার। একবছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আরবী ভাষা আয়ত্ব করেছে। মাদ্রাসার ছাত্ররা তার কাছে পড়তে আসে। মেহেদী কোন টাকা নেয় না তাদের কাছ থেকে। শুধু বলে আমার জন্য দোয়া করো।

আজ খাদেম সাহেব বাড়ি যান নি। মেহেদীর ঠিক পিছনে বসে তেলওয়াত শুনছেন তিনি। চুপি চুপি কখন যে খাদেম সাহেব তার পিছনে বসেছেন টেরই পায়নি মেহেদী। সে কেবলই তেলওয়াত করে চলেছে। তেলওয়াতের সময় কোন দিকে খেয়াল থাকে না তার। কেবল মাঝে মাঝে ফুরিয়ে কেদে ওঠে। একসময় তার কাদা দেখে খাদেম সাহেবও শব্দ করে কেদে ফেলেন। তিনি আরবী বোঝেন না।

কোরআনে কি বলা হচ্ছে জানেন না। কিন্তু মেহেদীর কাদা দেখে নিজেকে সামলাতে পারেন না।

তার কাদার শব্দ শুনে পিছনে তাকায় মেহেদী। খাদেম সাহেবকে পিছনে বসে থাকতে দেখে লজ্জায় লাল হয়ে যায় সে।

তুমি একটু যে আয়াতটি পড়লে ওটার বাংলা আমাকে একটু শোনাও তো বাবা। চোখ মুছতে মুছতে বলে খাদেম সাহেব।

মেহেদী শুরু করে ....

(একজন কাফির) বলল, এই কোরআন তো জাদু। এটা মানুষের লেখা। আমি অবশ্যই তাকে সাকার নামক জাহান্নামে প্রবেশ করাব। (হে নবী) তুমি জান কি সাকার নামের জাহান্নামটি কেমন? সে মেরেও ফেলবে না বাচিয়েও রাখবে না। চামড়া খসিয়ে দেবে। ....

এতটুকে বলতেই কোন রকম ভদ্রতা না করে মা হারা শিশুর মত কাদতে থাকেন খাদেম সাহেব।

মেহেদী পড়তে থাকে.................

..................তোমাদের কি কারনে সাকার নামক জাহান্নামে ঢুকতে হল। তারা বলবে আমরা সালাত পড়তাম না। আমরা মিসকীনদের খাবারও দিতাম না। আর যারা আল্লাহর দ্বীন নিয়ে তামাশা করে আমরাও তাদের সাথে তামাশা করতাম। এই অবস্থায় আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়। তাই আজ কারও সুপারিশ কোনও কাজে আসবে না। তাহলে কেন তারা এই কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সুরা মুদ্দাসছিরের শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলে মেহেদী।

বাসায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় মেহেদীর। প্রতি দিনের চেয়ে আজ একটু বেশিই রাত হয়েছে। তখনও বাবা আর ছোটমামা গল্প করছেন।

ক্লাসের পড়া নেই? মোটা গলায় বলেন রহীম সাহেব।

মেহেদী কিছু বলেনা কেবল আস্তে করে বাবার চোখের আড়াল হয়ে যায়।

ওকে নিয়ে আর পারা গেল না বলতে বলতে আলোচনায় ফিরে যান রহীম সাহেব।

ফজরের সালাতের পর কোরআন পড়তে বসে মেহেদী। ছোটমামা আর বাবা তখনও ঘুমিয়ে। মামা ঘুমিয়েই মেহেদীর তেলওয়াত অল্প অল্প শুনতে পারছিলেন। বেশ সুন্দর সুরে কোরআন তেলওয়াত করছে মেহেদী। মামা অন্যমনস্ক হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন।

ঘুম থেকে উঠেই তোর জোড় শুরু করে দেন রহীম সাহেব। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন অফিসের সময় হয়ে গেছে এখন তাড়াতাড়ি রওয়ানা হতে হবে। মন্টু তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। তাকে ঘুমন্ত অবস্থাতে রেখেই অফিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান তিনি।

ছোটমামা অনেক বেলা হলে ঘুম থেকে উঠলেন। হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে মেঝের উপর বিছানাতে বসলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি খাওয়া দাওয়া করলেন খাওয়ার সময় মিরাজকে ডাকলেন। মেহেদীকে ডাকলেন না। মেহেদীর কথায় তিনি খুবই কষ্ট পেয়েছেন। তিনি মেহেদীর ভাল চান বলেই কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু মেহেদী তাকে এমন কথা শুনিয়ে দিয়েছে যা তিনি কোনদিন ভুলবেন না।

খাওয়া দাওয়া করে মেহেদী আবার কোরআন পড়তে শুরু করে। আগে তার অনেক সঙ্গি সাথি ছিল। তাদের সাথে আড্ডা দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত। এখন ওসব বন্ধুদের সাথে মেশে না। এখন তার সঙ্গি কেবল কোরআন। হাদীসের বইও পড়ে। বই পড়তে তার খুব মজা লাগে। বই পড়তে পড়তে কখন সময় চলে যায় টেরই পায় না।

মামা চেয়ারে বসে একটু দুর থেকে মেহেদীর দিকে তাকান। তার চোখ যেন আটকিয়ে যায়। মেহেদীকে খুব সুন্দর লাগছে। সাদা টুপি মাথায় দিয়ে দুলে দুলে

কোরআন পড়ছে সে। কিভাবে যেন মেহেদী বুঝতে পারে মামা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তেলওয়াও করতে করতেই একটু মুখ ঘুরায় মামার দিকে। সে মামার দিকে মুখ ঘুরালেই মামা তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। যেন সে মামার অনেক পুরনো শত্রু।

মামা বুঝতে পারছেন না মেহেদী ক্লাসের পড়া কখন করে। এসে পর্যন্ত তিনি তাকে কেবল কোরআন হাদিস পড়তেই দেখছেন। মনে মনে খুব রাগ হয় তার।

যদি আমার ছেলে হত তবে মজা বুঝিয়ে দিতাম ওকে। দাঁত কিটমিট করে অস্পষ্ট আওয়াজে বলেন মেহেদীর মামা।

তারও একটি ছেলে আছে। তার নাম রেন্টু। খুব ভাল ছাত্র সে। সুযোগ পোলেই মামা তার প্রশংসা করেন। কি কঠিন শাসনের মধ্যে রেখেছেন তাকে। কিভাবে সে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে। একবার তাকে টপকিয়ে প্রথম হয়ে যায় এক ছেলে পরে তাকে কিভাবে টেনে নামিয়েছে রেন্টু, এসব গল্প প্রায়ই করেন ছোট মামা।

মামা অদুরেই বসে আছেন দেখে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাংলাতে কোরআন পড়া শুরু করে মেহেদী।

তুমি কি তাকে দেখনি যে একজন বান্দাকে সালাত পড়তে নিষেধ করে। তোমার কি মনে হয়। যদি যাকে নিষেধ করা হচ্ছে সে সঠিক পথে থাকে এবং আল্লাহকে ভয় করার কথা বলে। (তাহলে নিষেধ কারির অবস্থা কি হবে?) (সুরা আলাক .. ৯-১২)

মেহেদী এই আয়াতের তাফসীর পড়েছে। একদিন আবুজেহেল আল্লাহর রসুলকে সালাত পড়তে দেখে রেগে যায়। সে বলে যদি মুহাম্মদ সালাত পড়া বন্ধ না করে তবে আমি পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করব। সে মনে মনে বলে মামা কি বুঝতে পারছেন যে, কাল আমাকে দাড়ি রাখতে নিষেধ করে তিনি আবু জেহেলের মতই কাজ করেছেন।

মেহেদী পড়তে থাকে . . . . . .

কখনওনা, তুমি তুমি তার আনুগত্য করবে না। বরং তুমি সাজদা কর। তাহলে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারবে। (সুরা আলাক-১৯)

না। আমি কখনই এদের আনুগত্য করব না। এরা আমাকে বলে সালাত পাঁচ ওয়াক্তই পড়। দাড়ি আর লম্বা জামার কি দরকার? আমার আল্লাহর সন্তুষ্টি দরকার। তার সন্তুষ্টির জন্যই সালাত পড়ি আমি। তার সন্তুষ্টির জন্যই দাড়ি ছেড়ে দিয়েছি। আমি আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তারই আনুগত্য করে যাব। তার আনুগত্যের ব্যাপারে কাউকে পরওয়া করবনা। সে যেই হক। মনে মনে বলে চলে মেহেদী।

কিছুক্ষণ পর কলেজে চলে যায় মেহেদী।

মেহেদীর মামা বেশ কিছুদিন থাকার উদ্দেশ্যেই আপুর বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিনই মেহেদীর সাথে দ্বন্দে জড়িয়ে পরেছেন তিনি। মেহেদীকে দেখলেই এখন তার অন্তর জ্বালা শুরু হয়ে যায়। এভাবে কতদিন থাকা যায় এ বাড়িতে। তিনি চলে যাবেন। আজই চলে যাবেন। ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে আপুকে বলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন ছোটমামা।

বাড়ি ফিরে যখন মেহেদী শুনলো মামা চলে গেছেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সেও। তার মনও প্রশান্ত হল। তাকেও কম কষ্ট দেয় নি ছোটমামা। মামা তার সব থেকে প্রিয় জিনিস নিয়ে খারাপ মন্তব্য করেছেন। তার বিশ্বাস, তার দ্বীনকে তিনি ছোট করেছেন। আল্লাহ যে কাজগুলো পছন্দ করেন তিনি সেগুলোকে পাগলামি বলেছেন। তার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। অবচেতন ভাবে এই কথাগুলো ভাবতে থাকে মেহেদী। মামাকে অপমান করেছে এজন্য মোটেও অনুশোচনা হয় না তার। মামা এরকম ব্যবহার পাওয়ারই উপযুক্ত। আল্লাহর দ্বীনকে যে অপমান করে সে মুসলিমদের কাছে অপমানিত হবে এটাই যৌক্তিক। মামাকে সেদিন কথাটি না শুনালে ভীষণ

অন্তরজ্বালা হত মেহেদীর। এখন সে তৃপ্তি অনুভব করে।

২.

আসরের সালাত পড়ে ধীর পায়ে বাড়ির দিকে হাটছে মেহেদী। তার মন মগজ সব কিছু জুড়ে রয়েছে আল্লাহর স্মরণ। কোরানের ভিতর জান্নাতের বর্ণনাগুলো যেন চোখের উপর ভাসছে। বার বার মনে পড়ছে আল্লাহর এই কথাটি ....

যখন তুমি তাকাবে তুমি দেখতে পাবে নিয়ামতে পরিপূর্ণ এক বিশাল রাজ্য।

কেমন হবে সে রাজ্য? চিন্তা করতে থাকে সে। নদী, ঝরনা, ফুল, ফলে পরিপূর্ণ এক অনন্ত জীবন। সেখানে থাকবে বাগান, বহুতল বাড়ি আর চির যৌবনা সঙ্গিনীরা। সেখানে মৃত্যু নেই, ঘুম নেই, নেই কেন ক্লান্তি। পাখাওয়ালা ঘোড়াতে চড়ে আকাশ ভ্রমন, জান্নাতের বাজার সমুহতে অবাধ বিচরণ। এসব কল্পনা করতে করতে মনে পড়ে যায় আল্লাহ বলেছেন আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু রেখেছি যা কোন চোখ কখনও দেখেনি কোন কান কখনও শোনেনি কোন অন্তর কখনও কল্পনাও করেনি।

এটা মনে পড়তেই তৃপ্তিতে মন ভরে যায় তার। এই জান্নাত পাওয়ার জন্য জীবন দিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় মেহেদীর।

রাস্তার পাশের স্কুল মাঠটি আজ লোকে লোকারন্য। বেশ কিছু গন্য মান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি জনসভা হচ্ছে ওখানে। মেহেদী যখন মাঠটি অতিক্রম করছিল তখন এলাকার এম.পি জনদরদী নেতা বিশিষ্ট সমাজ সেবক আবুল হোসেন মিঞা বক্তব্য রাখছিল। মেহেদী একনজর তাকায় তার দিকে। সে খুব ভালোভাবেই চেনে লোকটাকে। কিছু দিন আগেও এত বড় নাম ছিল না তার। সবাই তাকে আবুল্যা বলে ডাকত। একসময় ফুটবল খেলার খুব বাতিক ছিল তার। তার বিশেষ বৈশিষ্ট হল খেলার মাঠে এলোপাতাড়ি দৌড়। খুব জোরে দৌড়াতে পারত সে। খেলার মাঠের প্রতিটি প্রান্তে তাকে দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু বলের সাথে খুব কমই সাক্ষাত হত আবুল হোসেনের। দৈবাত কখনও বলটি পেয়ে গেলে ওটি নিয়ে এমন বেগে ছুটত যে বেশিরভাগ সময়ই তার সাথে পেরে না উঠে পিছিয়ে পড়তো বলটি। তখন প্রায়ই উত্তেজনাকর ফুটবল মেচ অনুষ্ঠিত হত কলেজ মাঠে। মেহেদী তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে তখন একবার এরকম একটি মেচ দেখতে গিয়েছিল। আবুল হোসেনও খেলওয়ার হিসাবে ছিল সে মেচে। রেফারির বাশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই আবুল হোসেন ঘোড়ার মত দৌড়াতে থাকে। মাথা উচু করে বলটি কোথায় একবার দেখে নেওয়ার পর চোখ কান বুজে সেদিকে ছুটছে। কিন্তু সে গিয়ে পৌছানোর আগেই বলটি ওখান থেকে চালান হয়ে যাচ্ছে মাঠের অন্য প্রান্তে। আবুল হোসেন ছুটছে সেদিকেও। এভাবে বলের তালাশে মাঠের প্রতিটি প্রান্তে হন্য হয়ে ঘুরছে সে। তার এই হারভাঙা পরিশ্রম সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও মেহেদীর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি কারণ সবাই তাকিয়ে ছিল বলের দিকে আর সে তাকিয়ে ছিল আবুল হোসেনের দিকে। হাফ টাইমের পরও বেশ কিছুক্ষণ ধরে শুন্য শুন্য অবস্থায় রয়েছে মেচটি। মাঠে টান টান উত্তেজনা। এমন সময় বিপক্ষ দলের গোলপোষ্টের অদুরেই বলের সাথে অনাকাঙ্খিত সাক্ষাত হয়ে যায় আবুল হোসেনের। বলটিকে একা পেয়ে ওটির উপর চরাও হয় সে। বলটি নিয়ে প্রায় প্লেনের বেগে দৌড়াতে থাকে। তাকে ওভাবে ছুটতে দেখে বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক তো হতবম্ভ হয়ে যায়। মাঠ ভর্তি দর্শক বুক ভর্তি উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কি হয় দেখার জন্য। গোলরক্ষী কোন রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করার পুর্বেই সোজা গোল

পোষ্টের ভিতরে ঢুকে পড়ে আবুল হোসেন। আনন্দে চিৎকার করে ওঠে দর্শকরা। কিন্ত না। গোল হয়নি। বেশ কিছুদুর আবুল হোসেনের সাথেই ছিল বলটি। তারপর পিছনে পড়ে গেছে। হতাশ হয়ে দাত মুখ খিচিয়ে আবুল হোসেনের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করতে থাকে পক্ষের দর্শকরা কিন্তু কোন দিকে খেয়াল নেই তার। গোলপোষ্টের জাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করে সে।

লেখা পড়াও বেশি দুর করেনি আবুল হোসেন। যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে তখন হেড স্যার একবার আসেন তাদের ক্লাসে। চশমা নিয়ে আসতে ভুলে যান তিনি। আবুল হোসেনকে পাঠান তার চশমাটি অফিস থেকে নিয়ে আসার জন্য। চশমাটি আনতে আনতে বদ বুদ্ধি খেলে যায় তার মাথায়। সে ওটি নিয়ে চম্পট দেয়। পরে অবশ্য তার বাবা তাকে চশমা সহ ফিরিয়ে আনেন। হেড স্যারও তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু স্কুলের ছাত্ররা তাকে দেখলেই বলে উঠত

চশমা চোর চশমা খোর

চশমা নিয়ে মারল দৌড়

সেই লজ্জাই আর স্কুলে যায়নি সে। আবুল হোসেনের কৈশর কেটেছে অভাব অনটনের মধ্যে। ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে সঙ্গ দোষে এক সময় বখে যায়। চাদাবাজী, রাহাজানী, খুন খারাবী ইত্যাদি অপকর্মই তার পেশা হয়ে দাড়াই। কলেজ পড়াশুনা করার ভাগ্য না হলেও ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক সংঘর্ষ তাকে ছাড়া জমতনা। এখানে ওখানে মাতাল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যেত তাকে। এখনও পর্যন্ত তার আচরণ পুর্বের মতই অশিষ্ট। তার চারিত্রিক অবস্থাও সর্বজন বিদিত। প্রায়ই পত্রিকার খবর হয় আবুল হোসেন। ১৬ বছরের এক অবিবাহিত যুবতীর সাথে তার সম্পর্ক প্রমাণিত হয়েছে মাত্র দুই মাস আগে। কিন্তু এখন অতগুলো লোকের সামনে চিৎকার করে কথা বলছে। তার লজ্জা করছে না। কিন্তু মেহেদীর লজ্জা করছে। এ সমস্ত লোক যে জাতির নেতা সে জাতিরই একজন হলে তো লজ্জাই করার কথা। এই তো কয়েক বছর হল নাম পরিবর্তন হয়েছে আবুল্যার। যেভাবেই হোক রাতারাতি অনেক টাকার মালিক হয়েছে সে। গত নির্বাচনে বিপুল ভোটে পাশ করে এম. পি হয়েছে। এখনও জনসমর্থন তারই পক্ষে। এখন তার নামের পরে হয়ত মিঞা নয়ত সাহেব যোগ না করলে মারাত্বক অপরাধ হয়।

যারা দিনের আলোয় ডাকাতি করে, প্রকাশ্যে মানুষের সম্পদ লুন্ঠন করে তারাই কিভাবে জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয় বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছে মেহেদী। আসলে একটি সমাজের বেশিরভাগ মানুষই অজ্ঞ ও মুর্খ হয়। তাদের মধ্যে জ্ঞানীদের সংক্ষা থাকে খুবই কম। অক্ষর জ্ঞান থাকলে বা বড় ডিগ্রী অর্জন করলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। বরং যে ব্যাক্তি আল্লাহকে ভয় করে আর ভাল আমল করে তাকেই জ্ঞানী বলে। আল্লাহ বলেন

একজন বোকা ছাড়া আর কেউ বা ইব্রাহীমের ধর্ম তথা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

অর্থাৎ যে কেউ ইসলাম সম্পর্কে উদাসীন রয়েছে আল্লাহ তাদের বোকা ও মুর্খ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কত শত কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক অমুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা সকলেই মুর্খ যদিও মানুষ তাদের জ্ঞানী মনে করে। কোরআনে একজন ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে যে অনেক বড় আলেম ছিল কিন্তু দুনিয়ার জীবনকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার কারণে আল্রাহ সুরা আরাফের ভিতর তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু পুরা দুনিয়াটাই তো দুনিয়াদারে পরিপূর্ণ। তাকওয়াবান লোক একেবারেই দুর্লভ। আল্লাহ স্পষ্ট করেই বলেছেন

আমার বান্দাদের মধ্যে খুব অল্প সংখকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (সুরা সাবা-১৩)

বেশিরভাগ লোকই দুনিয়া ছাড়া কিছু বোঝেনা। যারা হারাম পন্থায় বহু টাকার মালিক হয়েছে, টাকার পিছনে ছুটে নিজের জীবন ও যৌবন নষ্ট করেছে, তাদের সম্পদ তাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে ফলে তারা সীমাহীন পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। বেশিরভাগ লোক তাদেরকেই পছন্দ করে। তাদের ভালবাসে। তাদের সামনে মাথানত করে। আর সৎ ও যোগ্য লোকেরা যদি কাড়ি কাড়ি টাকার মালিক না হয় তবে এসকল দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতে তাদের কোন মুল্যই নেই। যখন আল্লাহ তালুতকে একদল বনী ইসরাইলের উপর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তখন তারা বলেছিল।

কিভাবে সে আমাদের উপর নেতৃত্ব পেতে পারে আমরাই তো নেতৃত্ব পাওয়ার বেশি উপযুক্ত তাকে তো পর্যাপ্ত সম্পদ দেওয়া হয়নি। (সুরা বাকারা-২৪৭)

আবার আল্লাহর রসুল (সঃ) যখন উসামাকে বড় বড় কুরাইশ নেতাদের উপর আমীর নিয়োগ করলেন তখন তারা নাখোশ হলে তিনি বললেন তোমরা এর পুর্বে তার বাবার নেতৃত্বকেও অপছন্দ করেছ অথচ সে নেতৃত্বের যোগ্য।

যদি সেদিন বেশিরভাগ লোকের ভোট নেওয়া হত তবে তালুত হেরে যেত হেরে যেত উসামাও অথচ আল্লাহ ও তার রাসুল সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা নেতৃত্বের যোগ্য।

এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে জনগন অপছন্দ করলেও কেউ নেতৃত্বের যোগ্য হতে পারে এবং যদি বেশিরভাগলোককে নেতা নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয় তবে তারা সমাজের বিত্তশালীদেরই পছন্দ করবে অথচ যত পাপ ও অশ্লীল কাজ এসকল বিত্তশালীরাই করে থাকে। আল্লাহ বলেন

আমি যখনই কোন এলাকাতে কোন রসুল প্রেরণ করেছি সে এলাকার বিত্তশালীরা বলেছে। তোমরা যা নিয়ে এসেছ আমরা তা অবিশ্বাস করি। (সুরা সাবা-৩৪)

এভাবেই গনতন্ত্র অধম ও অযোগ্য প্রার্থীদের উপর উঠে আসার সুযোগ করে দেয় আর সৎ ও যোগ্য ব্যাক্তিদের জন্য ক্ষমতায় আহরণের কোন পথ খোলা রাখেনা। যতক্ষণ না তারাও কুট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কত নিকৃষ্ট এ পন্থা।

এসব ভাবতে ভাবতে অনেক সময় কেটে যায়। এদেরকে ধিক্কার দিতে দিতে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় মেহেদী। আবুল হোসেন তখনও চিৎকার চেচামেচি করে কথা বলছে। তার ঠিক পিছনে বসে রয়েছেন মসজিদের ইমাম সাহেব। তিনি খুব মনযোগ দিয়ে শুনছেন আবুল হোসেনের কথা। ঠিক যেমন মনযোগ দিয়ে শোনেন বান্ধা বাজারের পীর সাহেবের কথা।

কোরআন পড়া মেহদীর নিয়মিত অভ্যাস। সকাল বিকাল নিয়মিত কোরআন অনেকেই তেলাওয়াত করে। কিন্তু মেহেদীর তেলওয়াতের সাথে তাদের বিস্তর ফারাক। মেহেদী না বুঝে কিছুই পড়েনা। যদি কখনও কোন আয়াতের অর্থ তার নিকট অস্পষ্ট মনে হয় তবে আরবী অভিধান খুলে বা এর ওর কাছে প্রশ্ন করে না জেনে নেওয়া পর্যন্ত তার মন শান্ত হয় না। কিন্তু এবার খুব জটিল একটি ধারায় পড়ে গেছে সে। কোন ক্রমেই তার জট খুলতে পারছে না। সেদিন এশার পর সুরা ইউনুস পড়ছিল মেহেদী। সুরাটির ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে।???

এই আয়াতে ইয়াহিদ্দী ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষাতে ক্রিয়াগুলো একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমে বা গঠনে প্রকাশিত হয়। সেই গঠনকে ব্যাকারনিক পরিভাষায় বাব বলা হয়। আরবী ভাষায় ৪৩টি বাব রয়েছে তার সবকয়টিই মেহেদীর নিকট পরিচিত। কিন্তু ইয়াহিদ্দী কোন বাব থেকে প্রকাশিত হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। শব্দটি সম্পুর্ণ সতন্ত্র গঠনের। কত রকম ব্যাকরণ আর অভিধানের বই তন্ন তন্ন করে

খুজেছে। কিন্তু এ রহস্যের সমাধান করতে পারেনি। কতবার মাদ্রাসার ছাত্র আর আশপাশের মসজিদের ইমামদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছে। তাদের কেউই বিষয়টির সদুত্তর দিতে সক্ষম হয়নি। বরং এ বিষয় নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যাথায় নেই। কবে কখন মুফতি পাশ করে সনদ পত্র হাসিল করার পর আর জ্ঞানের চর্চা করে না তারা। তার এরকম প্রশ্ন শুনলেই ভয়ে আতকে ওঠে। এসকল মুফতিরা কেবল গতানুগতিক ও সদা প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়েই ফতওয়া দিতে সক্ষম। তাও আবার একে বারে সংকির্ন দৃষ্টি ভঙ্গিতে আবদ্ধ থেকে। মেহেদীর এলাকা হতে বেশ দুরে একটি বড় কওমী মাদ্রাসা আছে। সেখান থেকে অনেক ছাত্র মাওলানা পাশ করে বের হয়। এই এলাকার যত মসজিদ আর ওয়াজের ম? বলতে গেলে ঐ মাদ্রাসার শিক্ষক আর ছাত্রদের দখলে। কোন ক্রমেই যখন মিলল না তখন মেহেদীর ইচ্ছা হল ঐ মাদ্রাসাতেই একবার যাবে সে। ওখানে নিশ্চয় বিষয়টির জট খুলবে। যেই ভাবা সেই কাজ লম্বা জোব্বা আর টুপি পরাই ছিল। ঘর থেকে সাইকেলটি বের করে মিরাজকে বলল

আমার সাথে যাবি?

কথা শুনে ব্যাঙের মত লাফিয়ে উঠল মিরাজ। কোথায়, কেন এসব কোন প্রশ্ন না করে তাড়াহুড়া করে প্রস্তুত হয়ে নিল সেও।

মিরাজকে বিভিন্ন গল্প শোনাতে শোনাতে এক সময় শহরের ব্যাস্ত রাস্তা ছেড়ে একটি মেঠো পথ ধরে মেহেদী। রাস্তাটি কাচা। ইচ্ছা করলে পাকা রাস্তা দিয়েও যাওয়া যায় মাদ্রাসাতে। কিন্তু তাতে অনেক ঘুরতে হয়। রাস্তাটির দুপাশে যতদুর চোখ যায় কোন বসত বাড়ি নেই কেবলই চাষের জমি। কয়েকদিন আগে ধান কেটে নেওয়া হয়েছে বেশিরভাগ জমিই ফাকা পড়ে রয়েছে। কোন কোন জমিতে পাট বোনা হয়েছে। কেউ কেউ আবার ধান চাষ করার জন্য জমি প্রস্তুত করার জন্য ব্যাস্ত। মাঠের কৃষকেরা শত কাজের মাঝেও কৌতুহলের দৃষ্টিতে ফেল ফেল করে তাকাচ্ছে মেহেদীদের দিকে। যেন কখনও দেখেনি এমন কোন অবাক জিনিস দেখছে তারা। আসলে এ সময় এ রাস্তায় গরুর গাড়ি ছাড়া অন্য কোন যানবাহন চলতে দেখা যায় না। ওদের ওভাবে তাকাতে দেখে মেহেদী সাইকেলটির দিকে তাকায় একবার। কাদার প্রলেপ পড়ে গেছে সাইকেলটির গায়। যে স্থানগুলো কাদার হাত থেকে বেচে গেছে সেগুলো চকচক করছে।

ইমাম সাহেব যাইবেন কনে? কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করে এক বৃদ্ধ কৃষক।

বান্ধা বাজারের মাদ্রাসায়।

ইমাম সাহেবের তো মাদ্রাসাতেই যাওয়ার কথা এরকম ভেবে আর কথা বাড়ায় না লোকটি।

শক্ত কাদার সাথে লড়াই করে খুব কষ্টে সাইকেলটি কোনরকমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মেহেদী। মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে রাস্তার উপর বেধে থাকা পানিতে স্নান সেরে নিচ্ছে এক দুটি শালিক পাখি। মেহেদীদের সাইকেলের আওয়াজ শুনে স্নান কাজ অসমাপ্ত রেখেই ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যাচ্ছে পাখি গুলো। কি আর করার পানির উপর দিয়ে সাইকেলটি ওপারে রেখে এসে আবার মিরাজকে কোলে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এভাবে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে যায় মেহেদী। এমন হবে জানলে কি আর কোনদিন এ পথে আসত। এভাবেও চলছিল কিন্তু কিছুদুর যেতেই চোখ কপালে উঠে গেল মেহেদীর। রাস্তাটি এক স্থানে এসে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। রাস্তার বুক চিড়ে দুপাশের পানি যাওয়া আসা করছে। পানির গভীরতা যে কত তা বুঝা যাচ্ছে না তবে হাটু পরিমান যে হবে তা সহজে অনুমান করা যাচ্ছে। কেবল একটা মাত্র চিকন গাছের গুড়ি লম্বা লম্বি ফেলে রাখা হয়েছে রাস্তা পারাপারের জন্য। ঐ গুড়িটির উপর দিয়ে মেহেদী নিজে হয় হয়তো পার হতে পারবে কিন্তু সাইকেল

নিয়ে পার হওয়া একে বারেই অসম্ভব। হতাশ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বোকার মত বসে মেহেদী।

বহুদুরে কর্মরত কয়েকজন কৃষক কিছুক্ষণ পর পর তাকাচ্ছে মেহেদীর দিকে। মেহেদী কি চায় বুঝে উঠতে পারছে না তারা। এভাবে অনেক্ষণ কেটে যায়। এরমধ্যে কৃষকদের বিশ্রামের সময় হয়, তারা দল বেধে চলে আসে মাটির রাস্তাটির নিকট। সারা মাঠের মধ্যে এটি ছাড়া বসার মত আর কোন স্থান নেই।

হুজুর কি কোথাও যাইবেন? একটু দুর থেকে প্রশ্ন করে একজন।

যাওয়ার তো ইচ্ছা ছিল বান্ধা বাজারের মাদ্রাসাতে কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা যাওয়া হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। হতাশা ভরা কণ্ঠে বলে মেহেদী।

কেন যাওয়া হবে না। আমি আপনার সাইকেল পার করে দিচ্ছি বলতে বলতে সাইকেলটি উচু করে ধরে হুড় হুড় করে পানিতে নেমে পড়ে লোকটি। হাটু পরিমান পানির ভিতর দিয়ে ছপ ছপ শব্দ করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যে সাইকেলটি ওপারে রেখে আবার ফিরে আসে কৃষকটি।

এই মতি, বাচ্চাডাও পার করে দে। বসে বসেই আদেশ করে একজন বয়স্ক কৃষক। তার কথা শুনার সাথে সাথেই চেংদোলা করে মিরাজকে পার করে দেয় মতি।

এবার মেহদীর পালা। ঐ চিকন গুড়িটির উপর ভিজা পায়ে পার হতে হবে ওর। প্রায় পাচ ফুট নিচে কর্দমাক্ত ময়লা পানি। পা পিছলিয়ে পড়ে গেলে আর কিছু হক না হক বাড়ি ফিরার মত অবস্থা থাকবে না। কিছুক্ষণ সাত পাচ ভেবে আস্তে আস্তে গুড়িটির দিকে এগিয়ে যায় মেহেদী। সযত্নে ওটির উপর পা রেখে আস্তে আস্তে এগুতে থাকে। আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে এক সময় ঠিকই ওপারে পৌছে যায়। ওপারে পৌছিয়ে কৃষকগুলোর দিকে তাকিয়ে ফিরে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে আবার রওয়ানা দেয়। যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল কৃষকরা তাকিয়ে থাকে তার দিকে। এক সময় তাদের চোখের আড়াল হয়ে যায় মেহেদী।

অনেক কষ্টের পর বান্ধা বাজারে পৌছায় মেহেদীরা। এখন রাস্তা পাকা। রাস্তার দুপাশে কাচা পাকা বাড়ি। লোকজন যাওয়া আসা করছে। সবাই কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সাইকেলটির দিকে। কাদার ভিতর চলতে চলতে বিশ্রি অবস্থা হয়েছে সেটির। এখনই একটি বিহিত না করলে মাদ্রাসা পর্যন্ত পৌছাতে পৌছাতে কত লোকের হাসির পাত্র হতে হবে তার ইয়ত্যা নেই। রাস্তার পাশের পুরানো বাড়ির সামনে শান বাধা একটি পুকুরে সাইকেলটিকে পরিষ্কার করে নিয়ে মুক্ত মনে আবার শুরু হয় যাত্রা। এখান থেকে মাদ্রাসাটি নিকটেই। এর ওর কাছে প্রশ্ন করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাদ্রাসাতে পৌছে যায়। সত্যিই অনেক বড় মাদ্রাসাটি। তিন তলা বিশিষ্ট লম্বা লম্বা ক্লাসরুম তিন দিক থেকে ঘিরে রয়েছে। একদিকে আম গাছের বাগান বেষ্টিত বোডিং। দরিদ্র ছাত্ররা এখানে ফ্রি থাকে। যারা সক্ষম তারা নিজেদের খাওয়া খরচ বহন করে। থাকার জন্য ভারা দিতে হয়না কাউকেই। এলাকার বিত্তশালীদের কাছ থেকে যে দান দক্ষিনা পাওয়া যায় তাতেই দেড় হাজার ছাত্র আর পচিশ ত্রিশজন শিক্ষক কর্মচারির ভালভাবেই দিন গুজরান হয়।

সাইকেলটি একটি গাছের নিচে রেখে মাদ্রাসাটি ভাল করে দেখতে থাকে মেহেদী। ওকে দেখে এগিয়ে আসে কয়েকজন ছাত্র। সালাম দিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারা।

আপনারা কি এখানকার ছাত্র?

জি হ্যা। আপনি কি কাউকে খুজছেন?

আপনাদের প্রিন্সিপল সাহেব কি আছেন এখন?

জি, মুহতামিম হুজুর অফিসেই আছেন। আমার সাথে আসুন আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি উনার কাছে

মিরাজের হাত ধরে টানতে টানতে মেহেদী ছাত্রটিকে অনুসরণ করে।

অফিসের ভিতর সাত আটজন শিক্ষক বসে রয়েছেন। বেশ কিছু চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে। সাদা দাড়ি ওয়ালা বয়স্ক একজনের দিকে তাকিয়ে . . . . .

হুজুর এই ছেলেটি আপনাকে খুজছে বলে মেহেদীকে রেখে বিদায় নেই ছাত্রটি।

মুহতামিম সাহেব কাগজ পত্র ঘাটাঘাটি করছিলেন একবার মাথা উচু করে তাকান মেহেদীর দিকে। হাত দিয়ে ইশারা করে বসতে বলে আবার ব্যাস্ত হয়ে পড়েন তিনি। অন্যান্য শিক্ষকরাও মজাদার কোন আলাপ আলোচনায় লিপ্ত রয়েছেন। এক্ষুনি মেহেদীর সাথে কথা বলার সময় নেই তাদের কারও। মেহেদী তাদের অবসরের অপেক্ষা করতে থাকে। এভাবে ১০/১৫ মিনিট অতিবাহিত হয়ে যায়। তার কথা যেন ভুলেই গেছেন মুহতামিম সাহেব। এদিকে মিরাজ বাড়ি যাওয়ার জন্য ছটফট করছে অনেক্ষণ নিরব সময় কাটিয়েছে সে। এতক্ষণ চুপ করে থাকা একেবারেই স্বভাব বিরুদ্ধ তার। বাবা মার সাথে হলে সেই কখন কাদাকাটি আরম্ভ করে দিত কিন্তু ভাইয়াকে কিছু বলার সাহসই হচ্ছে না। কেবল একবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছে ভাইয়া বাড়ি চল।

মেহেদী কিছু বলেনি কেবল গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেছে।

আসসালামু আলাইকুম। হঠাৎ মোটা গলায় টানা সালাম শোনা যায়।

একযোগে সালামের উত্তর দিতে দিতে চোর পুলিশ দেখলে যেমনটি করে ঠিক তেমন লাফিয়ে খাড়া দাড়িয়ে যান সমস্ত শিক্ষকরা। দাড়িয়ে যান ৫০ বছর বয়সী মুহতামিম সাহেবও। মেহেদী দাড়ায় না বসে বসেই কেবল তাকিয়ে থাকে আগন্তকের দিকে। ইনি বান্ধা বাজারের পীর সাহেব। নাম সামসুজ জোহা। বিভিন্ন এলাকাতে শত সহস্র ভক্ত শাগরেদ আছে তার। প্রতি বছর ওরশে একত্রিত হয় তারা। তিন দিন ব্যাপি তাদের ওয়াজ নসিহত শোনান তিনি। সে নসীহতের প্রবল প্রভাবে দিশেহারা হয়ে নাচানাচি লাফালাফি করতে থাকে মুরীদরা। নাচতে নাচতে কেউ কেউ পাশেই গেড়ে রাখা বাসের উপর উঠে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে মাটিতে। কেউ কেউ প্রায় উদভ্রান্তের মত ছুটতে থাকে। কেউ আবার মৃগীরোগীর মত কাপাকাপি করে। সে এক হাস্যকর কান্ড। তার কিছু ভক্ত মুরীদ মেহেদীদের এলাকাতেও আছে। সপ্তায় একদিন মাগরিবের পর মসজিদে উচু স্বরে জিকির করে তারা। একদিন মেহদীও তাদের সাথে জিকির করতে বসেছিল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করতে করতে হঠাৎ ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ জিকির শুরু করে মজলিশের সবাই। তাদের মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে মেহেদী।

কি ভীষণ অজ্ঞ এসব হতভাগারা। একটি বাক্যের পুরো অংশ উচ্চারণ না করে এমন ভাবে একটা শব্দ কেটে নিয়েছে যে তাতে অর্থ ঠিক থাকে না। ইল্লাল্লাহ অর্থ আল্লাহ ছাড়া। এ কেমন জিকির। ইসলামের সাথে এ কেমন বেয়াদবী।

সেই থেকে ওদের জিকিরের ধারে কাছেও ঘেষতনা মেহেদী।

খাদেম সাহেব বান্ধা বাজারের পীরকে মোটেও পছন্দ করেন না গত বার সে নাকি তার মুরীদদের আবুল হোসেনকে ভোট দেওয়ার আদেশ দিয়েছে। সে কারণে প্রায়ই খোলাখুলি তার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেন তিনি। তিনি বলেন

ইব্রাহিম (আঃ) এর আগুনে ফু দেওয়ার কারণে আল্লাহর রসুল গিরগিটিকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ গিরগিটির ফু আগুন পর্যন্ত পৌছায় না। কিন্তু গিরগিটি আগুনে ফু দিয়ে নমরুদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে তাই তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে।

আবুল হোসেন পাপ কাজ করে সে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে অন্য আইনকে সমর্থন করে তাকে সমর্থন করার কারণে বান্ধা বাজারের পীরও তার পাপে ভাগিদার হবে। তাকে সমর্থন করে চরম অপরাধ করেছেন তিনি। তিনি জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হয়েছেন।

তবুও প্রতি দিনই তার ভক্তদের জিকিরের মজলিসে বসতেন তিনি। ভাল কাজে তিনি বন্ধু শত্রু সবার সঙ্গে থাকেন।

কি ব্যাপার তোমাকে জিকিরে দেখি না যে? একদিন আসরের সময় মেহেদীকে মমতা মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন খাদেম সাহেব।

মেহেদী সব কিছু বুঝিয়ে বলে তাকে। সে বলে

আল্লাহ আমাদের সলাত পড়তে বলেছেন সলাতের ভিতর রুকু করতে হয়, সাজদা করতে হয় আরও অনেক কাজ করতে হয়, অনেক কিছু পড়তে হয়। যদি কেই শুধু রুকু করে চলে আসে তবে তার সওয়াব তো হবেই না বরং মহা পাপ হবে। এমনকি সে কাফিরও হয়ে যেতে পারে। অনুরুপ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলে শুধু ইল্লাল্লাহ বলে জিকির করাটা চরম বেয়াদবী। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা সুরা আরাফের ২০৫ নং আয়াতে নিচু স্বরে জিকির করেতে আদেশ করেছেন উচু স্বরে জিকির করা ইসলাম পরিপন্থি।

এমনিতেই বান্ধা বাজারের পীরের উপর তেলেবেগুনে জ্বলা খাদেম সাহেব। মেহেদীর মুখ থেকে এসব শুনে তার রাগ তিন গুন হয়ে যায়। মুরীদানেরা পরবর্তী দিন জিকির করতে আসলে তাদের চরম অপমান করে তাড়িয়ে দেন তিনি। মসজিদে ইমাম সাহেবও বান্ধা বাজারের পীরের মুরীদ। কিন্তু খাদেম সাহেবের উপর কথা বলার সাহস নেই তার। মসজিদে খুব প্রভাব আছে খাদেম সাহেবের। তিনি অনেক ছোট থেকে সলাত পড়েন সেই থেকেই বিনা মুল্যে খেদমত করেন মসজিদটির। মসজিদটির সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক। তিনি প্রায়ই বলেন

আল্লাহর রসুল (সঃ) বলেছেন হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা ৭ শ্রেনীর ব্যাক্তিকে তার আরশের নিচে ছায়া দেবেন যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে একজন যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে। তিনি বলেন আমি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। এই মসজিদের জন্য অনেক কিছু করেছেন তিনি। বলতে গেলে তার অবদানেই মসজিদটি এখন এই রুপ পেয়েছে। তাই মসজিদের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তকেই চুরান্ত ধরা হয়। তার সাথে প্রতিযোগিতায় নামে না কেউই।

মেহেদী একনজরে তাকিয়ে থাকে পীরে কামেল সামসুজজোহা সাহেবের দিকে। তাকে দুদিক থেকে ঘিরে ধরে আছে দুজন অনুগত ভক্ত। একজন একটি মোটা সোটা ব্যাগ অতি কষ্টে বহন করছে আর অন্য জন তখনও ছাতা ধরে রেখেছে পীর সাহেবের মাথার উপর যেন সে ভুলেই গেছে যে, বেশ কিছুক্ষণ আগেই ঘরে প্রবেশ করেছেন পীর সাহেব। দুজনের মাঝে খুবই বেমানান লাগছে পীর সাহেবকে। প্রস্থে চালের কন্টেইনারের মত হলেও দৈর্ঘে খুবই খাটো তিনি। তাকে এর আগে কয়েকবার দেখেছে মেহেদী কিন্তু লম্বা লম্বা দুজনের মাঝে একটু বেশিই খাটো মনে হচ্ছে। হঠাৎ করেই অনেক আগে শোনা একটা গল্প মনে পড়ে যায় মেহেদীর।

এক নামী দামী পীর লম্বাই খুবই খাটো ছিলেন। দেশ বিদেশে বেশ নাম যশ ছিল তার। তাকে সবাই পিচ্চি বাবা বলে ডাকত। শত সহস্র মুরীদও ছিল তার। একবার নতুন একটি লোক তার মুরীদ হয়। পীর সাহেবকে দেখলেই বসে পড়ত লোকটি। পীর সাহেবের সামনে বসলে বেয়াদবী হয় এ কথা পুরান মুরীদরা কত করে বোঝাল তাকে। কিন্তু মুরীদটি একবারেই নাছোড় বান্দা পীর সাহেবের সামনে দাড়াতে পুরোপুরি নারাজ সে। একদিন পীর সাহেব

কোন এক স্থানে দাওয়াত খেতে যাবেন। তার নিয়ম ছিল সাথে একজনের বেশি নিয়ে না যাওয়া। সেবার তিনি সেই নতুন মুরীদটিকেই সঙ্গে নিলেন। পীর সাহেব যতদুর হেটে গেলেন লোকটি মাথা হেট করে প্রায় রুকু করার মত করে পথ চলছিল। তাকে ওভাবে হাটতে দেখে পীর সাহেব পুরো রাস্তাটাই হেটে গেলেন সেদিন আর পালকি নিলেন না। সারা রাস্তা মুরীদটি ওভাবে হেট হয়েই যাওয়া আসা করল। ফিরে এসে পীর সাহেব এক বিশ্বস্ত মুরীদকে পাঠালেন তার কাছে ওভাবে কুজো হয়ে হাটার কারণ জিজ্ঞাসা করার জন্য। সে বলল আমাদের পীর সাহেব লম্বাই খাটো দাড়ালে আমার মাথা তার মাথার উপরে উঠে যায় এটা চরম বেয়াদবী তাই আমি উনার সাথে কুজো হয়ে চলা ফেরা করেছি। আর একারনেই উনার সামনে না দাড়িয়ে বসে থাকি। তার কথা শুনে ভীষণ খুশি হয়ে যান পিচ্চি বাবা। তার জন্য মন খুলে দোয়া করেন। এতে সে ব্যক্তি বড় আল্লাহর ওলী হয়ে যায়।

এই পীর সাহেবের মুরীদরাও এমন করে নাকি। মনে মনে ভাবে মেহেদী কিন্তু তেমন মনে হচ্ছে না তার কাছে। কলাগাছের মত লম্বা দুজন লোক পীর সাহেবের দুপাশে দাড়িয়ে রয়েছে। তাদের মাথা পীর সাহেবের মাথার এক দেড় ফুট উপরে।

দেখা মাত্র ৭/৮ জন লোক আসামীর মত দাড়িয়ে গেছে দেখে বেজায় খুশি হয়ে যান পীর সাহেব। তৃপ্তি মুখে পান খেয়ে লাল করা দাত গুলো বের করে হাসতে হাসতে সবার মুখের দিকে তাকাতে থাকেন তিনি। মেহেদীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই আমাবস্যার রাতের মত কালো হয়ে যায় তার মুখখানা। এত বড় বড় ব্যক্তিরা তার সম্মানে বিদ্যুতের থাম্বার মত দাঁড়িয়ে গেছে আর এই বাচ্চা ছেলেটির কি সাহস যে সে স্থির বসে রয়েছে।

মেহেদীর দিকে তাকাতে তাকাতেই হাতল ওয়ালা চেয়ারটিতে বসার চেষ্টা করেন পীর সাহেব। কিন্তু দুই হাতলের মাঝে তার অতবড় দেহটি কোন ক্রমেই ঢুকাতে না পেরে আবার দাড়িয়ে যান। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন সবকটি চেয়ারই হাতল ওয়ালা। খোলা চেয়ার নেই? বলতে বলতে মুহতামিম সাহেবের দিকে তাকান তিনি।

কিছুক্ষণ হা করে দাঁড়িয়ে থাকেন মুহতামিম সাহেব। যেন তিনি চিন্তা করছেন খোলা চেয়ার আবার কি জিনিস। একটু পর ব্যাপারটি বুঝতে পেরে লাফ মেরে বেড়িয়ে পরেন অফিস থেকে। বেশ কিছুক্ষণ পর দুহাত দিয়ে উচু করে একটা চেয়ার নিয়ে এসে রাখেন পীর সাহেবের সামনে। নিজের জুব্বার এক প্রান্ত দিয়ে মুছতে মুছতে বলেন, বসুন হুজুর।

চেয়ারটির দিকে একনজর তাকিয়ে দেখেন পীর সাহেব। অন্য চেয়ার গুলির মতই দুটি হাতল ছিল চেয়ারটির। ডান দিকের হাতলটি এখনও টিকে আছে আর বাম দিকেরটি ভেঙ্গে গেছে। চেয়ারটিকে ভাল করে দেখে নিয়ে মুহতামিম সাহেবের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকান তিনি। তার খুব অপমান বোধ হচ্ছে।

নতুন কিছু চেয়ার বানাতে দিয়েছি হুজুর। ওগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই তৈরী হয়ে যাবে। অপ্রস্তুতের মত জবাব দেন মুহতামিম সাহেব। অত বড় মহান ব্যক্তির জন্য একটি ভাঙা চেয়ার নিয়ে আসার কারণে তিনিও লজ্জিত।

চেয়ারের ভাঙা অংশের উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে অর্ধেক শরীর বাম পাশে ঝুলিয়ে চেয়ারটিতে বসে পড়েন পীর সাহেব। মুহতামিম সাহেবের সাথে লম্বা আলোচনায় জড়িয়ে পরেন তিনি।

সেই কখন থেকে বসে আছে মেহেদী। খুব বিরক্তি লাগছে তার। মিরাজ কিন্তু আর ছটফট করছেনা মোটা লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দেখার পর থেকে শান্ত হয়ে গেছে। কখন থেকে ভাইয়াকে একটা কথা বলবে মনে করছে কিন্তু সুযোগ হচ্ছে না। সবাই

যখন আলোচনায় মত্ত তখন মেহেদীর কানের কাছে মুখ রেখে বলে

ভাইয়া এই লোকটা কি কলা গাছ খায়?

ওর কথা শুনে ভীষন অবাক হয় মেহদী। হাসি চেপে রেখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ শুনেছে কিনা।

চুপ ! মিরাজকে নিচু স্বরে ধমকায় মেহেদী।

ভাইয়ার ধমকে চুপ হয়ে যায় মিরাজ। কিন্তু তার এখনও মনে হচ্ছে লোকটি আসলে কলা গাছ খায়। প্রায় প্রতি বছর গহরহাটির বাজারে সারকাস বসে। গত বছর বাবা মার সাথে সারকাস দেখতে গিয়েছিল মিরাজ। সারকাসে কত রকম নাচ গান হয়, দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে খেলা দেখায়, কেউ কেউ এক চাকার সাইকেল চালায় এসব কিছুই ভাল লাগেনি মিরাজের। কিন্তু হাতি দেখে খুব মজা হয়েছে তার। ওখানে ৩টি হাতি ছিল। শুর দিয়ে কিভাবে কলা গাছ খাচ্ছিল হাতিগুলো? অত বড় প্রাণী কখনও দেখেনি মিরাজ। সেই থেকে মিরাজের মোটা হওয়ার সখ। সারকাস দেখে বাড়ি এসে পাশের বাড়ির হৈমর সাথে যুক্তি করে চুরি করে কলাগাছ কেটে খেয়েছিল। সে কথা মিরাজ কাউকে বলেনি কিন্তু হৈম সব ফাঁস করে দেয়। তা নিয়ে এলাকায় মানুষের কাছে কত হেনেস্তা হতে হয়েছিল তাদের। এই লোকটিও হাতির মত মোটা এ লোকটিও নিশ্চয় সবাইকে না জানিয়ে কলাগাছ খায়। এসব কথা মনে মনে ভাবে মিরাজ। ভাইয়াকে এসব বলা যাবে না ভাইয়া এসব বুঝবে না। কেবল ধমক দেবে।

পীর সাহেব বিভিন্ন বিষয়েই আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ আবার দৃষ্টি দেন মেহেদীর দিকে।

এ ছেলে কি আপনাদের ছাত্র?

না হযরত, এ কি একটা প্রয়োজনে এসেছে এখানে।

এই ছেলে তুমি কি চাও? আলোচনায় ছেদ পড়ার কারণে একটু বিরক্ত হয়েছেন মুহতামিম সাহেব।

হুজুর আমি অনেক দুর থেকে আসছি। আমার একটা প্রশ্ন আছে। কি প্রশ্ন দ্রুত বলে ফেল। যেন সে চলে গেলে ভাল হয় এমন ভাবে বলেন পীর সাহেব।

মেহেদী ব্যাপারটি খুলে বলে তাদের। সবাই তার কথা মনযোগ দিয়ে শোনে। প্রশ্নটি সম্পুটি শোনার পর সবাই অপ্রস্তুত হয়ে যায়। আসলে এমন প্রশ্ন আশা করেননি তারা। পীর সাহেবের মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে উত্তর নেই তার কাছেও। তিনি এমন ভাব করতে থাকেন যেন তিনি প্রশ্নটি শোনেনেই নি। প্রশ্নের জটিলতা বুঝতে পেরে প্রশ্নটির হাত থেকে পালানোর উপায় খুজতে থাকে শিক্ষকবৃন্দ উপায় খুজছেন পীর সাহেবও কিন্তু কোন কুল কিনারা করতে পারছেন না তারা।

তোমারা বাড়ি কোথায়? কোনার দিক থেকে প্রশ্ন করেন এক জন শিক্ষক। শিউলী তলা। তুমি তো দেখছি বাড়ির পাশে নদী ফেলে মরুভুমিতে এসেছ পানি খুজতে।

মুজফফর হুজুরকে চেন?

অবাক হয়ে আস্তে আস্তে করে মাথা নাড়ে মেহেদী। তাদের এলাকাতেই বাড়ি মুজাফফর হুজুরের। আগে সবাই তাকে মুজাফফর হুজুর বলত। তখন অনেক সম্মান ছিল তার। মেহেদীদের মসজিদে ইমামতি করত। জানাযার সলাত আর ঈদের সলাতও তাকেই পড়াতে হত। তাকে ছাড়া ধর্মীয় কোন কাজই হত না এলাকাতে। কিন্তু হঠাৎই অবস্থা পাল্টে যায়। ২/৩ বছর আগে তার স্ত্রী মারা যান। হুজুরের বয়স তখন প্রায় ৫০ বছর। তার পর একাই ছিলেন। বেশ কিছু দিন আগে আপন চাচাত ভায়ের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। মেয়েটির বয়স ১৪/১৫ বছরের বেশি হবে না। ৫০ বছর বয়সে মেয়ের বয়সী চাচাত ভায়ের কন্যার সাথে বিয়ে করার কারণে সমাজের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যান তিনি। এখন সবাই তাকে মুজাফফর বলে। কেউই সম্মান দেখায় না। কোন ধর্মীয় কাজে তাকে ডাকাও হয় না। এই শিক্ষকটির মুখে

মুজাজফফর হুজুরের কথা শুনে তাই খুব অবাক হয় মেহেদী।

মুজাফফর হুজুর তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ওর ভাবনাতে বিরতি এনে বলে শিক্ষকটি।

মিরাজের হাত ধরে অফিস থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়ে যায় মেহেদী। এবার পাকা রাস্তা দিয়েই যাবে।

যানবাহন আর পথচারীদের ভীড়ের মধ্যে দিয়েই খুব দ্রুত সাইকেলটি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেহেদী। আর মিরাজ এক নাগাড়ে বকে চলেছে।

ভাইয়া এটা কি? ওটা কি? এটা এমন কেন? বাড়ি কতদুর?

ওর কথার উত্তর না দিয়ে উপরের দুকে তাকাই মেহেদী। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। গহর হাটির বাজারে পৌছালে জোহরের আযান শোনা যায়। শিউলি তলা এখান থেকে বেশি দুরে নই। দ্রুত যেতে পারলে ১০/১৫ মিনিট লাগে। গহর হাটির মোড় থেকে পশ্চিম দিকের রাস্তাটি সোজাসুজি শিউলি তলা পর্যন্ত পৌছায়। এ রাস্তাটি অনেক নিরিবিলি। ভারি যানবাহন চলে না বললেই চলে। দুপাশে সারি সারি গাছ বেশ কিছুক্ষণ পর পর দুএকটি কাঠের দোকান অসহায়ের মত তালা বন্ধ রয়েছে। সাইকেলের গতি বাড়িয়ে দেয় মেহেদী। কিন্তু ২/৩ মিনিট অতিবাহিত হতে না হতেই ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। সে বৃষ্টিকে আমল না দিয়ে আরও জোরে ছুটতে থাকে মেহেদী। মুহূর্তের মধ্যে বৃষ্টির তীব্রতা বেড়ে যায়। উপায়ন্তর না দেখে পাশের কাঠের দোকানটির সামনের ছাউনির নিচে আশ্রয় নেই দুজন। উপরের দিকে চেয়ে মেহেদী ছাউনিটি পর্যবেক্ষন করে। বাজারে ৫০/৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয় এমন পলিথিনের নিচে পাঠকাঠি রেখে কাবারি নিয়ে বেধে ছাউনিটি তৈরি করা হয়েছে। অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে ওটির উপর দিয়ে। তারের বাধন গুলো ঢিলা হয়ে গেছে। বাসাতের ঝাপটাই যে কোন মুহূর্তে উড়ে যেতে পারে সেটি। সাইকেলটি দোকানে ঠেস দিয়ে ছাউনিটি দুহাত দিয়ে টেনে ধরে মেহেদী।

লোহার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটালে যেমন শব্দ হয় সেভাবে করাৎ করাৎ করে শব্দ করতে থাকে। অনেক কষ্ট করেও নিজেকে সামলাতে পারেনা মিরাজ। এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। কিন্তু মেঘের গর্জন শুনে ভয়ে সংকুচিত হয়ে গেছে তার ছোট মুখ খানা। প্রথমে দু'তিন বার ফুফিয়ে নিয়ে মেঘের গর্জনের সাথে পাল্লা দিয়ে উচু স্বরে কাদতে শুরু করে সে। মেহেদী দুহাত দিয়ে ছাউনিটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে এক মিনিটও ছেড়ে দেওয়ার উপায় নেই। কেবল মুখ দিয়ে মিরাজকে চুপ করানর চেষ্টা করে সে। ওর শান্তনা শুনে কাদার গতি থামাতেই কড়াৎ করে আবার শব্দ হয়। সমস্ত শান্তনা ভুলে চিৎকার করে আবার কেদে ওঠে মিরাজ।

বাইরে প্রবল বেগে বারি বর্ষন হচ্ছে হাওয়ার দোলায় চারপাশ থেকে ছিটকে আসা পানিতে হাটু পর্যন্ত ভিজে গেছে মেহেদীর লম্বা জামাটি। মিরাজকে সাইকেলের উপর বসিয়ে রেখেছে। ওর পর্যন্ত পানি পৌছাচ্ছে না।

বৃষ্টির তিব্র চাপ সহ্য করতে না পেরে ধনুকের মত বাকা হয়ে গেছে ছাউনিটি। চুয়ে চুয়ে দুএক ফোটা পানি পড়ছে ছাউনির ভিতর দিয়েও। হঠাৎ বাতাসের প্রবল আঘাতে স্থানচুত হয়ে যায় পলিথিনের ছাউনিটি। মেহেদী যে কাবারিটি ধরে রেখেছিল সেটে তার হাতে রেখেই উড়াল দেয়। কিছুক্ষণ হাতের কাবারীটির দিকে চেয়ে থাকে মেহেদী। দুএকটি তার তখনও কাবারীটির গায়ে লেগে রয়েছে্ যখন বুঝতে পারে সত্যিসত্যিই ছাউনিটি উড়ে গেছে তখন কাবারিটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে মিরাজের পাশে দাড়ায়। লম্বা জামাটি দিয়ে ঢেকে বৃষ্টির হাত থেকে বাচানোর

চেষ্টা করে ছোটভাইকে। কিন্তু জামাটি খুব বেশিক্ষণ রক্ষা করতে পারে না তাকে। শকুনের মত চুপচাপ বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে দুই ভাই। মিরাজও আর কাদছেনা বৃষ্টিতে ভিজে কাদার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। কেবল থর থর করে কাপছে। বান্ধা বাজারের পীরের মুরিদরা যেভাবে জিকির করে।

বাড়িতে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই ভীষন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে মিরাজ। বৃষ্টিতে ভেজা একেবারে সহ্য হয় না তার। তার মাথার কাছে বসে সেবা শুশ্রুষা করতে করতে শত সহস্রবার মেহেদীকে বকতে বকতে রায়হানা বেগম।

ভাইয়ার কোন দোষ নেই মা। বাতাসেই তো পলিথিনের চালটি উড়িয়ে নিয়ে গেল। তা না হলে কি আর আমাদের ভিজতে হত?

মেহেদী পাশের ঘর থেকে ওর কথা শুনে অবচেতন ভাবেই হেসে ওঠে। সে এখনও ভাবছে সুরা ইউনুসের আয়াতটি নিয়ে। ৩/৪ দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও ব্যবহারটির কোন সুরাহা হল না। আজ নিশ্চয় রহস্যের জট খুলবে। মুজাফফর হুজুর নিশ্চয় ব্যপারটি সমাধান করতে পারবেন।

আছরের ছলাত পড়ে মুজাফফর হুজুরের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে মেহেদী। ঠিক বাড়ির সামনে বৈঠক খানার পাশে দেখা হয়ে যায় হুজুরের সাথে। তিনিও পশ্চিম পাড়ার মসজিদ থেকে সালাত পড়ে আসছেন। হুজুরকে দেখে ছালাম দেয় মেহেদী।

সালামের উত্তর দিতে দিতে বৈঠক খানাতে একটি চেয়ারের উপর বস পড়েন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, আসলে মেহেদী তার কাছেই প্রশ্ন করতে এসেছে। আগে প্রায়ই মানুষ তার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে আসতো কিন্তু এখন আর কেউ আসে না।

মেহেদী বেশ কিছুক্ষন দাড়িয়ে থাকে।

তুমি কি কিছু বলবে? তার দিকে আবার দৃষ্টি ফেলে প্রশ্ন করেন বয়স্ক মানুষটি।

মেহেদী লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

উঠে এসে বস। সানন্দে বলেন মুজাফফর হুজুর। দেখে মনে হয় আনন্দে ফেটে পড়বেন তিনি।

বেশ কয়েকটি চেয়ার পাতা রয়েছে বৈঠক খানাতে। হুজুরের সামনা সামনি একটি চেয়ারে বসে মেহেদী। তার প্রশ্নটি খুলে বর্ননা করে শোনায় হুজুরকে।

তার কথা শুনে চোখ কপালে উঠে যায় অর্ধশত বছরের অভিজ্ঞ মানুষটির। তিনি প্রশ্নটির উত্তর জানেন কিন্তু এইটুকু ছেলের মুখে অমন বড় মাপের প্রশ্ন শুনে প্রায় আকাশ থেকে পড়েছেন।

তুমি কোন মাদ্রাসাতে পড়? উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন।

আমি কলেজে পড়ি মাদ্রাসাতে কখনও পড়িনি। বলতে বলতে সসম্মানে হুজুরের দিকে দৃষ্টি দেয় মেহেদী। তিনি এমনভাবে মেহেদীকে দেখছেন যেন সপ্তাশ্চার্য একসাথে সামনে পেয়ে গেছেন। তিনি যারপর নায় খুশি হন মেহেদীর উপর। সব কয়টি বাব কি তোমার জানা আছে? কয়েকটি বাবের নাম বলতো।

কয়েকটি নয় প্রায় এক নিশ্বাসে প্রায় সবকয়টি বাবের নাম বল ফলে মেহেদী। একটু দম নিয়ে আবার শুরু করতে যায়।

বুঝতে পেরেছি তুমি পারবে। তাকে থামিয়ে শব্দ করে হাসতে হাসতে বলেন হুজুর।

শোন, ইয়াহিদ্দী ক্রিয়াটি ইফতিয়াল বাবা থেকে বের হয়েছে। ইফতিআলের তা,অক্ষরটি হুদা শব্দের হার সাথে মিলিত হয়ে শব্দটি ইয়াহিদ্দী হয়েছে। বুঝেছ? মেহেদীকে খুব বেশি বুঝাতে হয় না। এতটুকু বলতেই আনন্দে লাফ মেরে ওঠে। কোরআনে কি

এরকম আর কোন উদাহরণ আছে? আবার প্রশ্ন করে মেহেদী।

হ্যা হ্যা আছে। ইয়াছিনের ৪৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وهم يخصمون

হয়েছে এখানে ইয়াখছিরুন শব্দটিও মুলে ইয়াখতাছিমুন ছিল পরে তা, সদের সাথে মিলিত হয়ে ইয়াখিছসিমুন হয়েছে। এটাও ইফতিআল বাব।

হুজুরের কথা খুব মনযোগ দিয়ে শুনতে থাকে মেহেদী। কত জ্ঞান তার। সেদিন বিদায় নিয়ে চলে আসে। তারপর সারারাত মুজাফফর হুজুরকে নিয়ে ভাবতে থাকে। সারা গ্রামের লোক এই মাটির মানুষটিকে ঘৃনা করে। মেহেদীর কিন্তু অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করছে এই জ্ঞানি ব্যাক্তিটিকে। সারা তল্যাটে যে প্রশ্নের সমাধান মেলেনি কত সহজে সেই প্রশ্নের উৎত্র দিয়ে দিলেন তিনি। এমন লোককে যে কেউই সম্মান করবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো আর তার জ্ঞানের খবর রাখে না।

সেদিন থেকে প্রায় প্রতিদিনই হুজুরের বাড়ি যাওয়া আসা করতে থাকে মেহেদী। আস্তে আস্তে সম্পর্ক গাঢ়ো হলে সে বুঝতে পারে বাইরে থেকে যেমন মনে হয় আর্থিক অবস্থা ততটা ভাল নয় হুজুরের। মৃত বাবা কিছু জমি জমা রেখে গেছেন সেগুলো বেশিরভাগই ইজারা দেন অল্প কিছু নিজে চাষ করেন। একটি গাভীও পোষেন। মেহেদী হয়তো দেখবে তিনি ধান মাড়ছেন বা গাভীটির জন্য বিচালী কাটছেন অথবা ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে অধ্যায়নরত রয়েছেন। ৫০ বছর বয়সের কাউকে বই অধ্যায়নরত দেখলে অনেকের বেক্ষাপ্পা লাগতে পারে কিন্তু মেহেদী জানে , ইসলামে বরনীয় আলেমদের ইতুহাস এমনই। মাঝে মাঝে গিয়ে বাড়িতে পায় না হুজুরকে। তিনি জমিতে ধান পরিদর্শন করতে গেছেন। কোন কোন দিন সে হুজুরের ধান ক্ষেতেই চলে যায়। তাকে দেখেই কাজ কর্মে বিরতি দিয়ে জ্ঞানের আলোচনা শুরু করেন হুজুর। সে আলোচনাতে বক্তা বা শ্রতার কেউই বিরক্ত হয় না। মাঝে মাঝে সকালে হুজুরের নাস্তা করার পূর্বেই চলে যায় মেহেদী। খাওয়া দাওয়া ভুলে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকে কোরআন ও হাদীসের ব্যাক্ষা শোনান তিনি। এতদিন অধ্যায়ন করে যে জ্ঞান ভান্ডার জমা করেছেন সেগুলো বিতরণ করার সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি মুজাফফর হুজুর। আলোচনা যেদিন খুব দীর্ঘ হয় বৈঠকখানার দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ শোনা যায়। হাসি মুখে মেহেদীর দিকে তাকিয়ে হুজুর বলেন

আমাকে খেতে ডাকছে। তুমি একটু বসো আমি এখনি আসছি।

১৫ বছরের চাচাতো ভায়ের মেয়েটি তাহলে ভালোই বাসেন হুজুরকে ভাবতে ভাবতে মেহেদীর ইচ্ছা হয় একদিন এ বিষয়ে প্রশ্ন করার।

সুযোগ বুঝে একদিন বিষয়টি উত্থাপন করে মেহেদী।

হুজুর সবকিছু খুলে বলেন তাকে। বলেন আর্লঅহর রসুল (সঃ) ৫৫ বছর বয়সে হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বিবাহ করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল ৭ বছর। আর নিজের আপন চাচাতো ভাই আলী (রাঃ) এর সাথে নিজের মেয়ে ফাতিমাকে বিবাহ দিয়েছিলেন। এসব কিছ ইসলামে নিষিদ্ধ নই। আল্লাহ যা হালাল করেছেন সেগুলো আমাদের হালালই মনে করতে হবে। কম বয়সের মেয়ে বিয়ে করা হারাম নই আবার আপন চাচাতো ভায়ের মেয়েও আপন ভায়ের মেয়ের মত নই। যদিও আমাদের সমাজের লোক এগুলো খারাপ মনে করে। সমাজের লোকোর আনুগত্য করা যাবে না কেবল মাত্র আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহর রসুল (সঃ) এর সময় আরব সমাজ পালিত পুত্রকে নিজের পুত্রের মত মনে করা হত আর পালিত পুত্রের স্ত্রীকে নিজের পুত্র বধুর মত হারাম মনে করা হত। কিন্তু আল্লাহ তার রসুল (সঃ) কে তার পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রী যয়নাবকে বিবাহ

করার আদেশ দেন। আল্লাহর রসুল (সঃ) যয়নাবকে বিবাহ করলে সমাজের লোক তার নামে দুর্নাম রটাতে থাকে। তারা বলে মুহাম্মদ নিজের পুত্র বধুর সাথে বিবাহ করেছে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে সুরা আহযাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি বলেছেন আল্লাহর নিকট পালকপুত্র আপন পুত্রের মত নই। আল্লাহর হুকুম মারতে যেয়ে আল্লাহর রসুল ও সমাজ মানেন নি। আমাদের সমাজ ও যদি আল্রাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যায় তবে আমরাও এ সমাজকে মানব না।

এসব কথা শুনে মুজাফফর হুজুরের প্রতি সম্মান বেরে যায় মেহেদীর। একসাথে যখন মসজিদে যায় তখন হুজুরের এক হাত পিছনে থাকে। জিবনে কাউকে এত সম্মান করেনি। মাঝে মাঝে যখন পুর্বপাড়ার মসজিদে সালাত পড়তে আসেন তখন হুজুরের পাশে বসে। বিদ্যুৎ চলে গেলে তাড়াতাড়ি পাখা নিয়ে এসে বাতাস করে। সারা গ্রামের লোক যে ব্যাক্তিকে ঘৃনা করে সেই ব্যাক্তি মেহেদীর পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

পাড়ার মুরিব্বীরা অনেকেই মেহেদীকে বারণ করেছে বিতর্কিত লোকটির সাথে মিশতে। মেহেদী তাদের কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে। বলেছে

তিনি একজন মহান ব্যাক্তি তাকে আপনারাই বিতর্কিত বানিয়েছেন। আল্লাহর রসুল ও এক শ্রেনীর লোকের কাছে বিতর্কিত ছিলেন। সেসকল মুর্খদের বিতর্কের কারণে তার সম্মান মোটেও কমেনি। বরং তারাই ধঙস হয়েছে। আপনারাই মুজাফফর হুজুরকে বিনা দোষে নিন্দা করে নিজেদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে নিচ্ছেন। আপনাদের জ্ঞান বুদ্ধি থাকলে বুড়ো বয়সে এসব কাজ করতেন না।

খুব শীঘ্র সারা গ্রামের ঘৃনার পাত্র হয়ে যায় মেহেদী। মেহেদীর তাতে কোন পরওয়া নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য ইসলাম মানে সে। মানুষের কাছে সম্মান পাওয়ার জন্য নই।

একদিন ফজরের সালাতের পর মেহেদীকে দাড় করান ইমাম সাহেব।

তোমাকে সারা গ্রামের লোক স্নেহ করত এমনকি বয়সে ছোট হয়েও তুমি অনেকের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলে। কিন্তু এখন তুমি এমন একজন ব্যাক্তির কাছে যাওয়া আসা করছ সারা গ্রামের লোক যাকে ঘৃনা করে। তিনি নিজের মেয়ের বয়সী চাচাত ভায়ের মেয়েকে বিয়ে করেছেন চাচাতো ভায়ের মেয়েতো নিজের মেয়ের মতই। তুমি কেন তার কাছে যেয়ে নিজের মান সম্মান নষ্ট করছ। কি দরকার তোমার তার কাছে।

মেহেদী অনেক্ষণ চুপচাপ শোনে ইমাম সাহেবের কথা। এক সময় ইমাম সাহেবের কথা শেষ হয়। তিনি মেহেদীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন। খাদেম সাহেব ও উপস্থিত ছিলেন।

মানুষ আপনাদের অনেক জ্ঞানী মনে করে কিন্তু আপনারা খালি কলসির মত। আসলাম সম্পর্কে সামান্যতমও জ্ঞান নেই আপনাদের। থাকলেও আমল করেন না আল্লাহ সুরা জুমআর ভিতর আপনাদের গাধার সাথে তুলনা করেছেন। আপনি জানেনেই না যে আল্লাহর রসুল ৫৫ বছর বয়সে হযরত আয়েশাকে বিবাহ করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল ৭ বছর আর তার আপন চাচাত ভাই আলীর সাথে নিজের প্রিয় কন্যা ফাতিমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ কাহিনী আমার খাদেম চাচাও জানে।

চাচা আপনি জানেন না এ কাহিনী? খাদেম সাহেবের দিকে মুখ তুলে তাকায় মেহেদী।

হ্যা হ্যা কেন জানবনা। আমরা যখন কায়দা পড়তাম তখনই আমাদের এসব কথা শুনিয়েছিলেন জামসেদ মওলানা।

মেহেদী আবার শুরু করে

যে কথা খাদেম চাচা কায়দা পড়ার সময় শিখেছে আপনি মুফতি পাশ করেও সে কথা জানেন না। কি

চরম হতভাগা আপনারা। আমি জানি আপনারা জানেন না তা নই। অন্য আর দশ জন লোকের থেকে অবশ্যই বেশি জানেন। কিন্তু আপনারা ছাত্র জীবন থেকে বিত্তশালীদের হাতের ময়লা খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। মুফতি পাশ করে সমাজপতিদের পোশা কুকুরে পরিনত হয়েছেন। তাদের ইচ্ছামত ফতওয়া দেন। তাদের হারাম টাকা পকেটে ভরে তাদের জন্য দুহাত তুলে দোয়া করেন। আপনাকে সেদিন দেখলাম আবুল হোসেনের মঞ্চে বসে তার ওয়াজ শুনছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে আপনি তাদের জন্য দোয়াও করেছেন। ১৬ বছরের মেয়ের সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক কারও অজানা নই। সারাটা দেশে অন্যায় অত্যাচার আর অশ্লীল কাজ করে চলেছে আবুল হোসেনরা। আল্লাহর আইনকে পায়ে ঠেলে নিজেদের ইচ্ছামত আইনে দেশ পরিচালনা করছে। আপনারা বৈধ কাজের কারণে মুজাফফর হুজুরকে হেয় করছেন। আর স্পষ্ট পাপাচার ও কুফরীতে লিপ্ত নেতাদের পায়ের কাছে মুখ থুবরে পরে আছেন। আপনাদের কথা আর যে কেউই গুরুত্ব দিক মেহেদী আপনাদের কথা মানেন না। মেহেদী নিজে কোরআন পড়ে, হিতাহিত জ্ঞান আছে তার। আপনাদের মত পেট পুজারী আলেমদের মেহেদী ঘৃনা করে। আপনাদের পেট হারাম রিজিক আর মিথ্যা কথাতে পরিপূর্ন। বিত্তশালীদের ইচ্ছা অনুযায়ী যখন যেমন চাহিদা তেমন ফতওয়া তেরী করে বাজারজাত করেন আপনারা।

মুখ লাল করে কলাগাছের মত দাড়িয়ে থাকেন ইমাম সাহেব। মাথা তুলতে পারছেন না। এত বড় অপমান হজম করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এক কথা বলে দশটি শুনেছেন। এখন আর কিছুই বলার শক্তি নেই তার। খাদেম সাহেব তৃপ্তির হাসি হাসছেন। ইমাম সাহেবের প্রতি তার অনেক দিনের রাগ। আবুল হোসেনের মঞ্চে যেয়ে তার বক্তব্য শুনে তার জন্য দোয়া করার মত নিকৃষ্ট কাজ যে করতে পারে সে এমন অপমানেরই যোগ্য। তুমি ঠিকই বলেছ বাবা। আলেমরা যখন থেকে পেটের দায়ে বিত্তশালীদের দাসত্ব শুরু করেছে সেই দিন থেকে ইসলামের জন্য বিজয়ের সমস্ত রাস্তা হয়ে গেছে।

চারপাশে ভীড় করে দাড়িয়ে ছিল কয়েকজন। সবকিছু শুনে তাদেরও মনে পড়ে গেল

সত্যিই তো আল্লহর রসুল ৫৫ বছর বয়সে ৭ বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন একথা কতবার শুনেছি আমরা। আর তার জামাতা আলী যে তার চাচাতো ভাই তা তে সবাই জানে তাহলে মুজাফফর হুজুরকে আমরা খারাপ বলি কেন?

ইমাম সাহেবের সাথে এ বিতর্কের কথা জানাজানি হয়ে যায়। এখানে সেখানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। কিছু লোক ইমাম সাহেবের পক্ষ নেয়। কিন্তু মেহেদীর পক্ষেই দল ভারি। সবার একই কথা মুজাফফর হুজুর যদি ঠিক কাজই করে থাকেন তবে তাকে ঘৃনা করা হচ্ছে কেন? আর ইমাম সাহেব যদি ভাল লোকই হবেন তবে আবুল হোসেনের মত কুচরিত্রের লোকের সাথে তার এত খাতির কেন?

এদিকে ঘটে যায় আরেক ঘটনা।

মেহেদীদের মসজিদের সভাপতি আকবার হাজী শুমুল তলী গ্রামের খুব পুরানো গেরোস্ত। ৭ ছেলে আর তিন মেয়ে তার। ৭ ছেলেকে নিয়ে প্রায় ১৫/১৬ বিঘা জমি চাষ করেন। চাষ করেই দুতলা বাড়ি বানিয়েছেন। বড় ছেলেকে মটর সাইকেল কিনে দিয়েছেন। গ্রামের ভিতর যারা সরকারী চাকরী করে তারাও অর্থের প্রতিযোগীতায় তার ধারে কাছেও ঘেষতে পারে না। লোক হিসাবেও খারাপ নন তিনি। উদার হস্তে দান না করলেও বিপদে আপদে পাড়া প্রতিবেশিকে সাহায্য সহযোগিতা করেন। সে কারণে গ্রামে বেশ জনপ্রিয়। ভোটে দাড়ালে চেয়ারম্যান না হলেও মেম্বার নিশ্চয় হতে পারতেন কিন্তু ওসব একেবারে অপছন্দ তার। একসময় তার প্রচেষ্টাতেই গ্রামের মানুষের চোখে

খারাপ হয়ে গিয়েছিলেন মুজাফফর হুজুর। মেহেদীর সাথে ইমাম সাহেবের তর্কের পর একরাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন তিনি মারা গেছেন। ইমাম সাহেব তার লাশটিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ হাজির হয়ে যান মুজাফফর হুজুর একটি লাঠি নিয়ে ইমাম সাহেবকে তাড়া করেন তিনি। ইমাম সাহেব পালিয়ে যান। মুজাফফর হুজুর জানাযার সলাত পড়ে দাফন করেন তাকে। স্বপ্নটি দেখার পর তার যে কি হয়েছে প্রায়ই এসে বসেন মুজাফফর হুজুরের বৈঠক খানায়। মেহেদীকে যখন তাফসীর আর হাদীস শোনান তখন উদাসিনের মত এদিক ওদিক তাকাতে থাকেন হাজী সাহেব। আলোচনার দিকে কোন মনযোগ থাকেনা তার। মুজাফফর হুজুর বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সামান্য থামলেই তার দুহাত চেপে ধরে কাদতে কাদতে বলেন

হুজুর, আমাকে ক্ষমা করেছেন তো? আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আপনি ক্ষমা না করলে আমি জাহান্নামি হয়ে যাব।

আপনাকে তো আমি সেই কবেই ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি তো অত খারাপ লোক নই যে আপনার মত মুরব্বী আমার কাছে ক্ষমা চাবে আর আমি ক্ষমা করব না।

তাহলে আপনি আমার জানাযার সলাত পড়াবেন। আবদার করে বসেন হাজী সাহেব।

সেই কবে থেকে গ্রামে সলাত পড়ান না মুজাফফর হুজুর হাজি সাহেবের কথা শুনে পুরানো কথা মনে পড়ে যায় তার।

হ্যা পড়াব। বলতে বলতে চোখ অশ্রুতে ভিজে যায় তার।

সেদিন শুক্রবার। পজরের সলাত পড়তে যেয়েই মেহেদী শুনতে পায় সত্যি সত্যিই হাজি সাহেব মারা গেছেন। সে খবরটি দেওয়ার জন্য দ্রুত চলে যায় মুজাফফর হুজুরের বাড়ি। হুজুর তখন মন ভার করে বেঠকখানাতেই বসে ছিলেন। মেহেদী বুঝতে পারে আগেই খবর পেয়ে গেছেন তিনি। অনেক্ষণ সেখানে বসে ছিল মেহেদী। প্রায় আধা ঘন্টা পর কাদতে কাদতে হাজী সাহেবের বড় ছেলে হাবলু আসে মুজাফফর হুজুরের বৈঠক খানায়। তার পিছনে জসতার ঢল নেমেছে। হুজুরকে জড়িয়ে ধরে অঝরে কেদে ফেলে হাবলু। কাদতে কাদতে বলে আব্বা কাকুতি মিনতি করে বলে গেছেন যেন আপনি তার জানাযার সলাত পড়ান। এটাই তার শেষ ইচ্ছা। আমরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করে সকাল ১০ টার দিকেই তার দাফন কাফন সেরে ফেলতে চাই। আব্বা এরকম বলে গেছেন। আপনি না করবেন না। আপনি সময় মত কবর স্থানে পৌছে যাবেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়। না করার কি আছে। হাজী সাহেব আমার কাছ থেকেও ওয়াদা নিয়েছেন। আমি সময় মত পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ। তোমরা সব কিছুর ব্যবস্থা করে ফেল যাতে করে তোমার সম্মানিত বাবার ইচ্ছানুযায়ী তার দাফনকার্য সম্পন্ন হয়। বলে চোখ মুছতে থাকেন।

সময়মত জানাযার সলাতের জন্য জড় হতে থাকে শিমুলতলার আশপাশের কয়েক গ্রামের লোকজন। লোকে লোকারন্য হয়ে যায় কবরস্থানটি। মুজফফর হুজুরও সাড়ে নয়টার দিকে হাজির হয়ে গেছেন। তার পাশে দাড়িয়ে রয়েছে মেহেদী। কিন্তু ইমাম সাহেব এখনও আসেনি। মুজাফফর হুজুর জানাযার সলাত পড়াবেন শুনে হিংসায় জ্বলে উঠেছেন তিনি। যার জন্য সেদিন অতগুলো কথা শুনেছেন তার পিছনে ছলাত পড়বেন ন। শুধু মেহেদী নয় সারা গায়ের লোক ইমাম সাহেবকে খুজছে। হাজী সাহেবের ছোট ছেলে কয়েক পাক মারল মাঠটিতে কিন্তু ইমাম সাহেবকে পাওয়া গেল না। হাজী সাহেবের ৭ ছেলে রাগে গজগজ করছে। ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতেই জানাযার সলাত শেষ হয়ে যায়।

লাশও দাফন হয়ে যায়। সমবেত লোকজনের সামনে হাবলু বলে, ইমাম সাহেবকে আজ মসজিদ থেকে বের করে দেব আমি। তার কথায় জনগন সম্মতি জানায়। হাবলু পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়ে। মুখে লম্বা দাড়ি আছে। বাবার অনুপস্থিতিতে এখন সেই মসজিদের অঘোষিত সভাপতি।

আজ জুময়ার সলাতের আযানের আগেই অনেক লোক সমাগম হয়েছে মসজিদ প্রাঙ্গনে। অন্যান্য দিন এসময় ৩/৪ জন লোকই পাওয়া যায় না। কিন্তু আজ হাজী সাহেবের মৃত্যুতে অনেকের অন্তরেই আখিরাতের ভয় সৃষ্টি হয়েছে। উপস্থিত রয়েছে হাজী সাহেবের ৬ ছেলে। হাবলু তখনও আসেনি। কিছুক্ষনের মধ্যে মটর সাইকেল নিয়ে হাজির হয় সে। আযানের ৫/৬ মিনিট আগে ঢুলতে ঢুলতে আসতে দেখা যায় ইমাম সাহেবকে। দেখা মাত্র প্রায় মৌচাকের মত তাকে ঘিরে ধরে জনগন। বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে থাকে। কেউ কেউ হানিজনক ভাষা প্রয়োগ করে তার প্রতি। হাবলু তো শেষ মেষ বলেই ফেলে,

আপনাকে লাঠিপেটা করা দরকার।

তার কথা শুনে ভীষন রাগ করেন ইমাম সাহেব। জুমআর সলাত না পড়িয়েই চলে যান। তার চলে যাওয়াতে কেউ কেউ হয়তো দুঃখ পেয়েছিল কিন্তু বেশিরভাগ জনগনই খুশু হয়।

ততক্ষনে চারিদিকে আযান শুরু হয়ে গেছে। খাদেম সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাবলু বলে,

চাচ,চলেন মুজাফফর হুজুরকে নিয়ে আসি। তিনিই এ পদের সবচেয়ে বেশি যোগ্য। আমি বললে হয়ত রাজি হবেন না কিন্তু আপনার কথা ফেলতে পারবেন না।

তুমি বরং একে নিয়ে যাও। বলে মেহেদীর দিকে হাত বাড়িয়ে ইশারা করেন খাদেম সাহেব।

নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই। মেহেদীকে নিয়ে দ্রুত মটর সাইকেল চালিয়ে চলে যায় হাবলু।

মুজাফফর হুজুরকে বাড়ি পাওয়া গেল না। তিনি পশ্চিম পাড়ার মসজিদে চলে গেছেন। মসজিদেই তার সাথে সাক্ষাত করল হাবলু। অনেক কাকুতি মিনতি করে তাকে রাজি করানোর চেষ্টা করতে লাগল সে। হুজুর চুপ করে ছিলেন কারও মুখের সামনে না করে দেওয়ার অভ্যাস নেই তার। আবার রাজি হবেন বলেও মনে হচ্ছে না। মেহেদী হুজুরের মনের ভাব বুঝতে পারে। ডান হাতটি আস্তে করে ধরে নিচু স্বরে বলে,

হুজুর, চলুন।

ওর কথায় যন্ত্রের মত মটর সাইকেলে উঠে বসেন হুজুর।

সেই থেকে পূর্ব পাড়ার মসজিদে আবার পদস্থ হন তিনি।

এসব ঘটনার পর থেকে অবস্থা পাল্টে যায় অধিকাংশ লোকের কাঝে আবার সম্মআনের পাত্র হয়ে ওঠেন মুজাফফর হুজুর। আগের মত আবার তাকে দেখলেই এপাশ ওপাশ থেকে সালাম দেয় এলাকার মানুষ। যেন কোন বড় পীরকে দেখছে তারা। কোথাও পাচ সিনিট দাড়ালেই বাড়ির ভিতর থেকে চেয়ার নিয়ে বেরিয়ে আসে কেউ না কেউ। তার কাছ থেকে খারাপ কিছু কখনই দেখেনি পাড়া প্রতিবেশীরা। সেই ছোট থেকে সলাত সওম পালন করেন। বিপদে আপদে মানুষের পাশে এসে দাড়ান। রাতে তাহাজ্জুত পড়ার সময় কান্না কাটি করেন। আলিয়া মাদ্রাসাতে ৭ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশুনা করার পর বাবা মারা যান। পরিবারের বড় ছেলে হিসাবে যাবতীয় দায় দায়িত্ব তার উপরই বর্তায়। তারপর আর মাদ্রাসা বা স্কুলে পড়েননি। কিন্তু বাড়িতে পড়াশুনা করেন। বই কিনে বাড়ি ভর্তি করে ফেলেছেন। সারাদিন সরারাত তিনি যে এসব বই পড়েন গ্রামবাসী তা জানে। কই আগের

ইমাম সাহেব তো এতো বই পড়েন না। কয়েক বছর আগেও মাদ্রাসার ছাত্ররা তার কাছে পড়তে আসতো। গ্রামের মানুষ তাদের জিজ্ঞাসা করতো তোমাদের মাদ্রাসাতে শিক্ষক নেই এখানে পড়তে আস কেন? ছাত্ররা হাসতে হাসতে বলতো আমাদের মাদ্রাসার শিক্ষকদের মুজাফফর হুজুরের কাছে পড়ানো দরকার। কেবল শয়তানের ধোকায় পড়ে আল্লাহর একজন ওলীকে অনেক কষ্ট দিয়েছে তারা। মেহেদীর কথায় হুশ ফিরেছে তাদের। এই মানুষটিকে এতকাল যে কষ্ট দিয়েছে সে জন্য এখন দুঃখিত গ্রামের মানুষ। তাকে আবার ভালবাসতে শুরু করেছে সবাই। গ্রামের পাপী ব্যাক্তিরা তার কাছে আসে তাওবা করার জন্য। ছোট বাচ্চারা ভয় পেলে তার কাছে নিয়ে আসে এলাকার মেয়েরা। তিনি তাদের সামনে যান না। স্ত্রিকে বলেন বাচ্চাটি নিয়ে এসো। সুরা ফাতিহা পড়ে ফু দিয়ে দেন। এলাকার মেয়েরা বলে মুজাফফর হুজুরের মধ্যে আল্লাহর রহমত আছে।

৩.

গ্রাম থেকে কলেজটি প্রায় ৩/৪ কিলো দুরে। মেহেদী সাইকেলে যাওয়া আসা করে। কলেজটি অনেক পুরানো। প্রায় ৬০ বছর আগে স্থাপিত হয়েছে। তার পর আস্তে আস্তে পরিবর্তীত হয়ে আজ জেলার মধ্যে আকৃতির দিক থেকে তৃতীয় বৃহতম কলেজ এটি। কিন্তু ঐতিয্যের দিক থেকে শুধু এলাকাতে নই সারা দেশে বরেণ্য কলেজটি। ৭১ এর মুক্তি যুদ্ধে এই কলেজটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বলে শোনা যায়। যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে পাকিস্থানী সেনা বাহিনী কলেজটিকে ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করত। এখানে অনেক অন্যায় অপরাধ করেছে সেসকল নরপশুরা। পরে মুক্তি যোদ্ধারা এখানে অপারেশন চালালে বহু সংখক পাকিস্থানি সেনা নিহত হয়। ১৬ই ডিসেম্বরের পর আশেপাশের এলাকায় বসবাসরত উর্দু ভাষাভাষী লোকদের এখানে জড় করে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। তাদের উপরও অবর্ননীয় নির্যাতন চালায় বাঙালীরা। দাদা দাদীরা যখন সেসব কাহিনী বর্ননা করেন গা শিউরে ওঠে। নানা বিধ কারনে তাই গহরহাটি সরকারী কলেজের নাম শুনলেই অশ্রু বিসর্জন করেন অনেকেই। কেন হয়েছিল এই যুদ্ধ? মতিউর রহমান, হামিদুর রহমান, মোস্তফা কামাল এদের কেনই বা শহিদ বলা হয়?

তারা স্বাধিনতার জন্য যুদ্ধ করেছিল তাই তারা শহীদ। একবার ক্লাসের ভিতর বিষয়টির ব্যাক্ষা করছিলেন রিফাত স্যার। মেহেদী তখন ৯ম শ্রেনীর ছাত্র। ইসলাম সম্পর্কে ততটা জানতনা। তবে ছোট থেকেই ভীষন কৌতুহলী সে। মনের ভিতর কোন প্রশ্ন জাগলে তার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত উদাস মনে বিষয়টি নিয়ে ভাবে। সে স্যারকে বলেছিল।

চট্রগামের উপজাতিরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। বেশ কিছু বাংলাদেশি সৈন্য তাদের হাতে নিহত হয়েছে অনেক উপজাতিও নিহত হয়েছে। এখানে কোন পক্ষকে শহীদ বলা হবে।

প্রশ্নটি শুনে স্যার যেন হতবম্ভ হয়ে যান। তিনি জানেন যেসব বাংলাদেশি সৈন্য নিহত হয়েছে তাদের শহীদ বলা হয় কারণ তারা দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করছে। আর স্বাধীনতার জন্য যেসব উপজাতি যুদ্ধ করছে তাদের সন্ত্রাসী বলা হয়। এটা স্পষ্ট দিমুখিতা এ হিসাবে পাকিস্থানি সেনাবাহিনী দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে আর মুক্তিযোদ্ধারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে।

যদি তখন মেহেদীর এত জ্ঞান থাকত তবে সে স্যারকে বলত

আপনারা নিজেদের খেয়াল খুশিমত শব্দ ব্যবহার করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে কেন ব্যক্তি শহীদ আপনারা জানার চেষ্টাও করেন নি কখনও কেবল নিজেদের পক্ষে শব্দটি ব্যবহার করছেন। ঠিক যে কাজ করার জন্য পাকিস্থানি সেনাবাহিনীকে হানাদার

বলছেন সেই কাজ করার জন্যই বাংলাদেশি সেনাবাহিনীকে শহিদ বলছেন। যে কাজের কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের মহান বীর বলে আখ্যায়িত করছেন একই কাজের জন্য উপজাতিদের সন্ত্রাসী বলছেন। আপনারা চরম বিশ্বাসঘাতক। আল্লাহর রসুলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল

একজন বীরত্ব প্রকাশের জন্য যুদ্ধ করে অন্য আর একজন সম্পদ পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে? তিনি বললেন যে ব্যাক্তি আল্লাহর দ্বীন বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করে সেই কেবল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যা চরম অপরাধ। কোন মুসলিমকে হত্যা করা এতই মারাত্বক যে আল্লাহ তার জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির হুকমি দিয়েছেন। কেবল মাত্র বৈধ কারণেই কোন মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে। ভাষা, বংশ, গোত্র, দেশ এসব ইসলামের দৃষ্টিতে অতি নগন্য বিষয় এসবের উপর ভিত্তি করে যে যুদ্ধ সংগঠিত হয় তাতে উভয় পক্ষয় অপরাধী। মুসলিমরা ভাষা, বংশ গোত্র দেশ ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উপর ইসলামকে প্রাধান্য দেয়। কেবল মাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যই মুসলিমরা যুদ্ধ করে। আল্লাহর রসুল (সঃ) বলেছেন,

যে ব্যক্তি জাতীয়তা বোধের দর্শনের উপর যুদ্ধ করে নিহত হয় তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্য। (সহীহ মুসলিম জিহাদ অধ্যায়)

কেবল তাকেই শহীদ বলা হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।

মেহেদী নিয়মিত কলেজে আসে ঠিকই কিন্তু নিয়মিত ক্লাস করে না। কোন একটি বই নিয়ে এসে কলেজের সামনে প্রশস্ত মাঠটির নিরিবিলি এক কোনে বসে পড়তে শুরু করলে আর ক্লাসে যাওয়া হয় না তার। ক্লাস করতে ভালও লাগে না। নাস্তিক ও কাফির লেখকদের প্রবন্ধে ভর্তি স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলো। বেগম রোকেয়ার অর্ধাঙ্গী লেখাটি পড়ার পর তো চাকু দিয়ে খন্ড বিখন্ড করে ফেলে পাঠ্য বইটি। লেখাটির কয়েকটি স্থানে ইসলামের উপর আঘাত দেওয়া হয়েছে। ইসলামকে খুব ভালোবাসে মেহেদী। ইসলামের উপর আঘাত আসলে শুধু বই কেন জ্যন্ত মানুষকেউ ফেড়ে ফেলতে পারে সে।

সেদিন কলেজে আসার পরই বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। বাধ্য হয়েই ক্লাসরুমে প্রবেশ করে মেহেদী। পিছনের দিকের একটা বেঞ্চে বসে জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে থাকে। দু একবার ক্লাসরুমের চারপাশে চোখ বুলায়। বেশিরভাগ ছাত্রই তার পরিচিত নই। তাকে কিন্তু সবাই চেনে। কারও চোখে চোখ পড়তেই মুচকি হেসে মাথা নাড়ছে। মেহেদীও মাথা নেড়ে পরিচিত অপরিচিত সকলের সাথে সৌজন্যতা বজায় রাখছে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ প্রবেশ করেন শাহনুর স্যার। তিনি পৌরনীতি পড়ান। এটি তার ক্লাস নয়। ইয়াছিন স্যারের ক্লাস। তিনি মেহেদীদের রসায়ন বিজ্ঞান পড়ান। শাহনুর সারের ক্লাস ছিল কলাভবনের দ্বিতীয় তলায়। তিনি প্রথমে সেখানেই গিয়েছিলেন কিন্তু ও ক্লাসের কোন ছাত্র আজ কলেজে আসেনি। ফাকা ঘরে কিছুক্ষন বসে থেকে স্যার চলে এসেছেন বিজ্ঞান ভবনে। এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করেছেন কিছুক্ষন। মেহেদীদের ক্লাসে স্যার নেই দেখে এখানে ডুকে পড়েছেন। মেহেদী শুনেছে পৌরনীতির স্যার নাকি ক্লাসের ভিতর ইসলাম সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেন। পর্দা, দাড়ি, সলাত, সওম ইত্যাদি বিষয়কে হেয় করে বক্তব্য দেন। লোকটি পুরোপুরি নাস্তিক। প্রায়ই নাকি অশ্লীল কবিতা লিখে ছাত্র ছাত্রীদের সামনে আবৃতি করে শোনান।

বৃষ্টির মধ্যে তোমাদের একটা হাসির গল্প শোনাই। বলে লম্বা একটা গল্প শুরু করেন শাহনুর স্যার। কিছুক্ষন পর বিরতি নিয়ে উচু স্বরে হাসতে থাকেন। ক্লাসের সবাই চুপচাপ, কেউ হাসছে না। পাগলের

মত একাই বেশ কিছুক্ষন হাসলেন। যখন টের পেলেন তার গল্প শুনে কেউ হাসেনি গাধার মত বোকা বনে গেলেন। মুখটা কাচুমাচু করে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। কিন্তু জমাতে পারছেন না।

এটা কি ক্লাস? প্রশ্ন করেন ছাত্রদের।

রসায়ন। সামনের বেঞ্চের কেউ কেউ উত্তর দেয়।

তিনি তো রস আনয়ন করতেই চেয়েছিলেন কিন্তু ছেলেপিলে গুলো একেবারে নিরস হলে কি করে পারা যাবে। তোমরা এখন আমার কাছ থেকে কি শুনতে চাও?

কেউ কোন উত্তর দেয় না। বিজ্ঞানের ছাত্ররা কলেজে এসে সাধারনত বিশ্রাম পায় না। আজ বৃষ্টি হচ্ছে। ইয়াছিন স্যার অনুপস্থিত রয়েছেন। একটু অবসর সময় কাটানোর ইচ্ছাই ছিল তাদের। কোথা থেকে ইনি উড়ে এসে তাদের সময়গুলো নষ্ট করছেন। এই অবাঞ্চিতের হাত থেকে মুক্তির প্রহর গুনছে ক্লাসের সবাই।

নিজের ইচ্ছামত কিছুক্ষন বকবক করে চলেছেন শাহনুর স্যার। বলতে বলতে অভ্যাস বশত একসময় বলে ফেললেন,

কোরআন যদি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্নই হত তবে ইংলিশ ভাষাই হত আরবীতে নয়।

তার কথা শুনে মাথায় ঝিলিক খেয়ে যায় মেহেদীর। সঙ্গে সঙ্গে দাড়িয়ে যায় সে। কিছু একটা বলে কিন্তু বোঝা যায় না। এতো বেশি রেগে গেছে যে ভালোভাবে কথাও বলতে পারছে না। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,

মুখ সামলিয়ে কথা না বললে কিন্তু পিঠের চামড়া থাকবে না। চোখে মুখে আগুন ঝরছে মেহেদীর।

ওর কথায়া কাজ হয়। কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে ফেলে নাস্তিকটি। মুচকি হেসে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি ঢেকে ফেলার চেষ্টা করে।

সেদিন বাড়ি ফিরে বই খাতা গুলো একরকম টান দিয়ে ফেলে ছাদের উপর চুপচাপ বসে থাকে মেহেদী। তার মনের মধ্যে তোড়পাড় হচ্ছে। ওরকম স্পষ্টভাবে কাউকে কখনও ইসলামের সমালোচনা করতে শুনেনি। এটাই তার প্রথম অভিজ্ঞতা। সে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছে না। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে ডান পাশের ফুলের টপটির দিকে। টপটির পাশেই একটা খোলামেলা জায়গায় পড়ে রয়েছে তার চাকুটি। মিরাজ হয়তো নিষেধাজ্ঞা অমান্য আবার চাকুটি নিয়েছে। তারপর ভুলে ফেলে গেছে। চাকুটির দিকে তাকাতেই তার চোখের সামনে শামীমের চেহারা ভেসে ওঠে কপালের উপর এক ইঞ্চির কাছাকাছি লম্বা একটা দাগ। সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। চারিদিকে চিৎকার চেচামেচি হচ্ছে। আকাশে ভেসে বেড়ানো খন্ড খন্ড মেঘের মত মনের পর্দায় ভাসতে থাকে পুরোনো সেই স্মৃতি। চাকুটি আস্তে আস্তে হাতে তুলে নেয় মেহেদী। ডান হাত দিয়ে মুঠো বেধে ধরে অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকে সেটির দিকে। মুখের রং পাল্টে যায় তার।

মাগরিবের সময় সলাত পড়ে মসজিদেই বসে ছিল মেহেদী।

মেহেদী.............মেহেদী................দম বন্ধ মানুষ যেভাবে কথা বলে তেমন চাপা গলার ডাক শোনা যায়।

কিছুক্ষনের মধ্যেই হাপাতে হাপাতে মসজিদের ভিতরে ঢুকে পড়ে কোমল। কোমল মেহেদীর খুবই নিকটতম বন্ধ। কলেজ জীবনের প্রথম থেকেই তার সাথে নিবিড় সম্পর্ক মেহেদীর। কোমল কয়েকদিন আগেও নিয়মিত সলাত পড়ত না তবে ইসলামের প্রতি তার ভালোবাসা ছোটকাল থেকেই। মেহেদী যখন কলেজ প্রঙ্গনে বা ক্লাসের ভিতর আনমনা হয়ে

বসে জান্নাতের জগতের সাথে বেতার সংযোগ স্থাপন করে জান্নাতের পরম আনন্দ দুনিয়াতে বসেই উপভোগ করার চেষ্টা করে তখন প্রায়ই তার সে চেষ্টায় বাধ সাজে। কোমল কাধে একটি ঝাকা মেরে বলে,

একা গেলে হবে না বন্ধু আমাকে নিয়ে যেতে হবে ওখানে।

মেহেদী তখন তাকে এমন ভাবে জান্নাতের বর্ননা শোনায় যে পুরোপুরি উতাল হয়ে যায় কোমল। কতবার মেহেদীর সাথে সলাত পড়ার ওয়াদা করেছে তারপর আর টিকে থাকতে পারেনি। তবে মাস দুই হল নিয়মিত সলাত পড়ছে কোমল। মেহেদীকে সে পীরের মত মানে। ইসলামের যে বিষয়েই মেহেদীর সাথে কারও তর্ক হয় কোমল মেহেদীর পক্ষ হয়ে কথ বলে।

তুমি কয়েকদিন কলেজে যেওনা। ভাল করে দম না নিয়েই বলতে শুরু করে কোমল। একটি থেমে বসতে বসতে আবার বলে,

ঠান্ডু তোমাকে খুজছে। শাহনুর স্যার তাকে সব কিছু বলেছে। ঠান্ডু তোমাকে পেলে ভয়ানক কিছু একটা করে ফেলতে পারে।

এমনিতেই কলেজে কয়েকদিন না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মেহেদী। কলেজের প্রতি তীব্র ঘৃনা হচ্ছে তার। ঠান্ডুর হাল চাল খুবই উছৃঙ্খল। যে কোন ধরনের অঘটন ঘটানো তার জন্য আস্বাভাবিক নই। দুই বার পুলিশের হাতে পর্যন্ত গেছে বাবার তদবিরে তাকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। ঠান্ড ইচ্ছা করলে যে মেহেদীর বড় রকমের ক্ষতি করতে পারে মেহেদী তা জানে। কিন্তু কমলের কাছে সব কিছু শুনে জেদ উঠে যায়।

তুমি কি আমাকে কাপুরুষ মনে করো নাকি?

মেহেদীর কথা শুনে কোমল বুঝতে পারে মেহেদী কাল কলেজে যাবে।

ঠিক আছে আমিও যাব। তোমার সাথেই থাকব। যা হয় দুজনের এক সাথেই হবে। কোমলের ঈমান যেন পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। মেহেদী আর কোমল ক্লাসেই ছিল। একটু পরেই ইয়াছিন স্যারের ক্লাস শুরু হবে। সারের অনুপস্থিতিতে হালকা হৈ চৈ হচ্ছে ক্লাসরুমের ভিতরে। হঠাৎ কোমল কনুই দিয়ে গুতো মারতে মারতে আস্তে করে বলে,

ঠান্ডু......ঠান্ডু.......

ভিতর দিয়ে যেন শীতল হাওয়া বয়ে যায় মেহেদীর। ডান হাতটি আস্তে করে রাখে পকেটের উপর।

হ্যাঁ চাকুটি আছে। সুবিধাজনক স্থানেই আছে।

ঠান্ডু ভিতরে ডোকে না। একজন অনুচরকে পাঠায় মেহেদীকে ডেকে আনার জন্য। মেহেদী বের হয়ে আসে।

আমার সাথে এস। কৃত্রিম গাম্ভির্য মিশ্রিত কণ্ঠে কথাটি বলে হাটতে শুরু করে ঠান্ডু।

ঠান্ডুসহ ওরা ৪ জন ছিল। মেহেদী হাটতে হাটতে ইচ্ছে করেই একটু পিছনে পড়ে যায়। ওদের মাঝে পড়ে গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। তার ঠিক পিছনে রয়েছে কোমল। মাঠের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে এসে থেমে যায় ঠান্ডুরা। মেহেদী তাদের থেকে এক দেড় গজ দুরে। ওদের ঘুরে দাড়ানো দেখে মেহেদী বুঝতে পারে কোনো আলাপ আলোচনার জন্য ডাকা হয়নি তাকে ঠান্ডুকে বেশি সময় দিলে গন্ডগোল বেধে যাবে। মোটেও ভালো হবে না সেটা। পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আগেই থামিয়ে ফেলতে হবে ওদের।

পৌরনীতির স্যারকে তুমি গতকাল কি বলেছ? আওয়াজ শুতে বোঝা যায় কোনো ধরনের উত্তর আশা করছে না ঠান্ডু।

মেহেদীও উত্তর দেয় না। কেবল ডান হাত দিয়ে চাকুটি বের করে বাম হাতে কড়ি আঙ্গুলের উপর রাখে। ছোট নোখটি ঘষতে ঘষতে হালকা ভাবে মাথাটি উত্তোলন করে। যেন সে উত্তর দিয়ে দিয়েছে।

পুরো অপস্তুত হয়ে যায় ঠান্ডুরা। জোব্বা পরা একজন হুজুরের কাছে চাকু থাকবে ভাবতে পারে নি তার। মুমুর্ষ রোগীর মত মেহাদীর মুখের দিকে ফেল ফেল করে তাকায় ঠান্ডু। মেহেদীর মুখে অকৃত্রিম ক্রোধের ছায়া যেন কাল বৈশাখী ঝড়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে চাকু ধরতে অভ্যস্ত। ৪ জন লোককে মিনিটের মধ্যে ক্ষত বিক্ষত করে দেওয়া মোটেও অসম্ভব নই। যে ছেলে ভরা ক্লাসের মধ্যে পৌরনীতির স্যারের চামড়া খুলে নিতে চেয়েছে সে যে আগপাছ চিন্তা না করে ঠান্ডুর চামড়া খসিয়ে দেবে তা প্রায় শতভাগ নিশ্চিত।

ঠান্ডু একেবারে নিরিহ মনে করছিল নামাযী ছেলেটাকে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে অবস্থা তা নই। এমন জানলে সে কখনই ঘাটত না। ঠান্ডু আর কিছুই বলে না। কেবল সাহস করে একবার তাকায় ছুরিটির দিকে। বালুর মত চকচক করছে সেটি। মেহেদীদের পাড়ায় প্রায় ৭/৮ ঘরের মানুষ হাস মুরগি জবাই করতে হলে মেহেদীর কাছেই আস। তাই প্রান প্রতিদিনই ধার নবায়ন করতে হয় চাকুটি। ঠান্ডু পুরোপুরি আত্মসমর্পন করে।

চাকুটি নামিয়ে ফেলো উস্তাদ। তোমার সাথে আমার কিসের বিবাদ? পৌরনীতির স্যার ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছে তুমি তার প্রতিবাদ করেছ এ তো মহান কাজ। এ কাজ তো আমদেরই করা উচিত ছিলো। আমরাও তো মুসলিম। আমরা কেবল তোমার সাথে আলোচনা করতে এসেছিলাম। যাও ক্লাসে যাও। এখুনি হয়তো ইয়াছিন স্যার চলে আসবেন। ঠান্ডু এ পর্যন্ত বলতেই

যান হুজুর। যান......। প্রায় একযোগে বলতে থাকে অনুচরবৃন্দ।

সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়াটাকেই নিরাপদ মনে করছে তারা। কেবল নিরীহ বিষদাতহীন লোকদের সাথেই সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায় ঠান্ডুরা। বিষধর সাপ দেখলে তারা অনিয়ন্ত্রিত পলায়নে অভ্যস্থ।

মেহেদী ঠান্ডুর চোখে চোখ রেখেই আস্তে করে পকেটে রেখে দেয় চাকুটি। ইয়াসিন স্যার তখন ক্লাসে যাচ্ছিলেন। দুর থেকে মেহেদীকে ঘিরে ৪/৫ জন ছেলেকে দেখে সবকিছু আচ করতে পারেন। তিনি ঘটনা জানেন। ঠান্ডুকেও চেনেন। মেহেদীকে ঠান্ডুর হাত থেকে রক্ষা করা ইমানী দায়িত্ব মনে হলো তার কাছে। ক্লাসরুমে না যেয়ে সেদিকেই রওনা হন।

কি হয়েছে ঠান্ডু? আসতে আসতেই প্রশ্ন করেন ইয়াসিন স্যার।

কিছু না স্যার। শাহনুর স্যারের সাথে নাকি মেহেদীর কি একটা হয়েছে সে বিষয়েই একটু আলোচনা করছি। কলেজে খুবই সম্মান ইয়াছিন স্যারের। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়েন। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। সারা কলেজের ছাত্ররা তাকে ভালোবাসে। অন্য স্যাররা কোনো না কোনোভাবে বখাটে ছাত্রদের হাতে হেনেস্তা হয়েছেন। কিন্তু ইয়াসীন স্যারকে কেউ দেখলে দুর দিয়ে হেটে যায় তারা।

শাহনুর ইসলাম সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করছে। মেহেদী তার প্রতিবাদ করেছে। তোমরা এখন শাহনুরের পক্ষ হয়ে মেহেদীকে ধমকাতে এসেছ? তোমরা কি মুসলিম নও? ইসলাম কি তোমাদের ধর্ম নই? তোমাদের মত মুসলমানের ঘরের যুবকেরা নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহন করছে বলেই শাহনুরের মত নাস্তিকরা আমাদের বুকের উপর বসে ইসলামকে হেয় করার সাহস পাচ্ছে। তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

স্যারের কথায় অকৃত্রিম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ঠান্ডুর চেহারায়। তার সত্যিই লজ্জা করছে। প্রতিদিন সকালে তার মা কুরআন পড়েন। ছোটবেলায় মা তাকে আল্লাহর রসুলের কাহিনী শোনাতেন। আবু জেহেল, আবু লাহাব কত কষ্ট দিয়েছিল তাকে। মার কাছে কাহিনী শুনতে শুনতে রসুল (সঃ) এর প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যেত। ইচ্ছা হত আবু জেহেলকে হাতে পেলে ছাতু বানিয়ে ফেলতাম। এখন শাহনুরের মত নাস্তিকরা আল্লাহর রসুলকে

আবার কষ্ট দিচ্ছে। আর ঠান্ডু তার পক্ষ নিয়ে মেহেদীকে শাষাতে এসেছে। কি আশ্চর্য! নিজের কাছেই বিষয়টি অবাব লাগে ঠান্ডুর।

স্যার চলুন। পৌরনীতির স্যারের একটা বিহিত করে আসি। কলেজে এসব চলতে দেওয়া যায় না। মনে হচ্ছে ভিতর থেকে রাগ উথলে উঠছে তার।

স্যারকে নিয়ে ঠান্ডুরা চলে যায়। কোমলও কি হয় দেখার জন্য তাদের পিছু নেয়। মেহেদী দাড়িয়ে থাকে সে গেলে অঘটন ঘটে যেতে পারে। শাহনুর স্যার তখন কলাভবনের দ্বিতীয় তলায়। তাকে ডেকে বের করে আনেন ইয়াসিন স্যার।

কি ব্যাপার স্যার, বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে আসে নাস্তিকটি। বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতে থাকে। ঠান্ডুকে দেখে অনুমান করার করা যাচ্ছে কিছু একটা করে ফেলেছে সে। মনে হয় সে বিষয়েই অভিযোগ করতে এসেছেন ইয়াছিন স্যার।

খুব বড় কিছু করে ফেলেনি তো ঠান্ডু? মুখে চিন্তার রেখা পড়লেও মনে আনন্দের দোল বয়ে যাচ্ছে নাস্তিকটির। ক্ষমতাশীন দলের মান্য করার মত না হলেও গন্য করার মত ব্যাক্তি তিনি। ঠান্ডু যদি রক্তপাতও ঘটিয়ে থাকে তবুও তা সামলে নিতে পারবের খুব সহজেই। বড়জোর হয়ত চিকিৎসার জন্য হাজার খানেক টাকা খরচা হবে। তা হোক কিন্তু অতগুলো ছাত্রের সামনে তাকে যে অপমানিত করা হয়েছে তার সাজা পেতেই হবে মেহেদীকে। ছেলেটি এখন বুঝতে পারবে শাহনুর কোন ধানের চাল।

তার ভাবনায় ছেদ ফেলে ইয়াছিন স্যার কড়া কণ্ঠে বলতে শুরু করেন,

তুমি আসার পর থেকে আমদের উত্তক্ত করছ। প্রায়ই ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে খারাপ মন্তব্য করছ বলে এতদিন সে যা যা বলেছে সেগুলো গননা করতে থাকে ইয়াসিন স্যার।

ইয়াসিন স্যারের বর্ননা শুনে লোম খাড়া হয়ে যায় ঠান্ডুর। ইচ্ছা হচ্ছে নাক বরাবর একটা ঘুষি বসিয়ে দিতে কিন্তু ইয়াসিন স্যার কথা শেষ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আমরা তোমাকে এভাবে চলতে দিতে পারি না। আমরা সিংহের সন্তান। তোমাকে টেনে ছিড়ে ফেলবে তোমার ক্লাসের ছাত্ররাই।

স্যার ঠিকই বলেছেন। যদি পৌরনীতির ক্লাসে আর কখনও ওরকম কথা শুনি তবে কলা ভবনেই আপনার লাশ দাফন হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি বলে ঠান্ডু তাকায় অনুচরদের দিকে।

নিশ্চয়.......... নিশ্চয়.............। নেতার কথার প্রতি পুর্ন সমর্থন জানায় অনুচরবৃন্দ।

ঠান্ডুর মুখে এ কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ে অপবিত্র নাস্তিকটি। নিজের তীর নিজের দিকেই ফিরে এসেছে দেখে কুল কিনার হারিয়ে ফেলে সে। নিরুপায় হয়ে বলে,

ঠিক আছে আমি আর ওমন কথা বলব না। কিন্তু সেদিন বেয়াদব ছেলেটা আমাকে যে অপমান করেছে তার কি হব?

মেহেদীকে বেয়াদব বলতে শুনে মাথায় রাগ উঠে যায় ঠান্ডুর। অল্প সময়ের মধ্যে তাকে ভালোবেসে ফেলেছে সে।

মেহেদীকে নিয়ে কিছু বললে কিন্তু থাবড়ে গাল ভেঙ্গে দেব। বলতে বলতে ডান হাত দিয়ে শক্ত করে পাকানো ঘুসিটি শাহনুরের নাকের কাছ থেকে ঘুরিয়ে আনে।

তাকে থামাতে থামাতে ইয়াছিন স্যার বলেন,

মেহেদী উত্তম কাজই করেছে। ইসলাম সম্পর্কে কেউ খারাপ কথা বললে তার সাথে এমন ব্যবহারই করতে বলা হয়েছে। আর তুমি তো অনধিকার চর্চা করেছ। তোমার কি সাহস যে তুমি আমর ক্লাসে গিয়ে আমার

ধর্মকে ছোট করেছ। আমি যদি সময় মত পৌঁছে যেতাম তবে তোমাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম ক্লাস থেকে।

কোমল তাকিয়ে দেখে শুকনো পাতার মত চুপসে গেছে স্যারের মুখখানা। যেন তাকে সত্যি সত্যিই ঘাড়ে ধাক্কা মেরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। একেবারে চুপ হয়ে যায় নাস্তিকটি। তার মনে হচ্ছে কথা বললেই কেউ না কেউ তোড়ে আসবে তার দিকে। নিশ্বাসের শব্দটিও নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করে সে। কলাভবনের ছাত্ররা জানালাতে ভিড় করে দেখতে থাকে পৌরনীতির স্যারের সাথে কি করা হচ্ছে। দাত বের করে খিল খিল করে হাসতে থাকে তারা। ওদের হাসি তীরের মত বিধছে, ওতের দাতগুলো সিংহের মতো হিংস্র মনে হচ্ছে। নিজেকে পুরা গুটিয়ে ফেলে শাহনুর। এ নিয়ে যতই ঘাটছে ততই অপমানিত হতে হচ্ছে। বিষয়টি নিরবে সহ্য করই ভালো। একবার কেবল অধ্যক্ষ সাহেবেকে ঘটনাটি খুলে বলে। ইচ্ছা ছিল ইয়াসিন স্যারকে ডেকে অন্তত কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দেবেন তিনি। সব শুনে অধ্যক্ষ সাহেব কিছুই বলেন নি। কেবল বোঝা যাচ্ছিল তিনি অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখেছেন। শাহনুরের এই পরিনতিতে তিনিও খুশি।

কোমল ফিরে যেয়ে সব খুলে বলে মেহেদীকে। মেহেদী কিছু বলে না। কেবল আস্তে করে বলে,

আলহামদু লিল্লাহ।

৪.

ছাদ থেকেই দৃষ্টি পড়ে রাস্তার দিকে। রেন্টু আসছে। প্রায় আধামন ওজনের একটা ব্যাগ নিয়ে কুজো হয়ে হেটে আসছে। মেহেদীদের বাড়ি আসতে হলে চৌরাস্তার মোড়ে বাস থেকে নামতে হয়। সেখানেই সারি সারি ভ্যান রিকসা দাঁড়িয়ে থাকে। অপরিচিত লোক দেখলে ১০ টাকাও চেয়ে বসতে পারে। তবে দামদর করলে ৫/৬ টাকাতেই রাজি হয়ে যাবে। রেন্টু কিন্তু ভ্যান নেয় নি। সে হেটেই আসছে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে থেমে পথচারীদের সাথে কথা বলছে। ফুফুর বাসা চিনতে খুব কষ্ট হচ্ছে তার। এর আগে দু-একবার মাত্র এসেছে। লেখা পড়া নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিল এতদিন। এখন যে কিভাবে ছুটি পেয়েছে সেটাই চিন্তার বিষয়।

এই রেন্টি.........এদিকে আয়। ওর কষ্ট দেখে ছাদের উপর থেকেই দুহাত তুলে চিৎকার করে মেহেদী।

ওর কথা শুনতে পায় ঠিকই কিন্তু ওকে দেখত পায় না। কিছুক্ষন এদিক সেদিক তাকিয়ে একজন মাওলানা সাহেবকে হাত নাড়তে দেখে রেন্টুর মনে হয় সম্ভবত মেহেদীই হবে লোকটি। বাড়িতে তার বাবা-মা প্রায়ই আলোচনা করেন ওকে নিয়ে। ওর বেশ ভুষা তাই রেন্টুর কাছে অপরিচিত নয়। বাম কাধের উপর ঝুলন্ত ব্যাগটিকে ডান হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে একরকম ছুটতে থাকে রেন্টু।

উফ! খুব কষ্ট হয়ে গেছে। ভ্যানেই আসছিলাম। এই বাজারের কাছে এসে লোকটা বলে কিনা আমি শিউলিতলা যাব না। ওতদুর গেলে আমাকে খালি ভ্যান নিয়ে ফিরতে হবে। ১৫ টাকা দেওয়ার কথা ছিল। আমি তার ১০ টাকা দিয়েছি। ব্যাটার শিক্ষা হোক। বলতে বলতে ব্যাগ হাতড়িয়ে কিছু একটা খুজতে থাকে রেন্টু।

ওর মোটেও শিক্ষা হয়নি। উল্টো তোমাকেই গাধার মত আধা কিলো হাটিয়ে নিয়েছে। ভাড়াও বেশি নিয়েছে। বাসস্টান্ড থেকে শিউলিতলা ৬ টাকা ভাড়া। একটু জোর করলে ৫ টাকাও নেই। হাসতে হাসতে বলেন রায়হানা বেগম।

ফুফুর কথা শুনে যেন একেবারে বোকা বনে যায় রেন্টু। ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ছোট বল বের করে মিরাজের হাতে দেয়। অপরিচিত আগন্তুকের

কাছ থেকে বলটি গ্রহন করে হৈমদের বাড়ির দিকে চলে যায় মিরাজ।

এসে পর্যন্ত রেন্টিকে মনমরাই দেখা যাচ্ছে। আগে যখনই আসত মেহেদীর সাথে এদিক-সেদিক ঘুরতে বের হত, ফুটবল খেলত। মেহেদীর সাথে এমনকি স্কুল পর্যন্ত চলে যেত। এবার তার উপর অসম্ভব নিরাবতা ভর করেছে। সবসময় কেবল উদাসিন থাকে। মুখে ভীষন বেদনার চিহ্ন। মেহেদীর সাথে অনেক কিছু বলা ইচ্ছা তার কিন্তু মেহেদীকে অযোগ্য শ্রোতা মনে হচ্ছে। সে যা বলবে সে জগতের লোক নই মেহেদী। তবে কাকে বলবে? অন্য কোন ভাই-বোন নেই রেন্টুর। বাবার একমাত্র সন্তান সে। পাড়ার কারও সাথেও খুব বেশি মেশে না। নিজের জিবনে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভয়ানক ঘটনাটি তাই সে কাওকে বলতে পারেনি। হঠাৎ মেহেদীর কথা মনে পড়ে। সে ঘটনা শুনানোর জন্যই এতদুর এসেছে রেন্টু। কিন্তু মনে হচ্ছে হয়ত আর বলা হবে না। মেহেদী শুনবে না।

কলেজ থেকে ফিরে রেন্টুকে খোজ করে মেহেদী। কোথাও পাওয়া যায় না তাকে। রেন্টু চলে গেছে বাজারের দিকে। ঘুরে বেড়ানোর জন্য নয়। এ এলাকাতে দেখার মত কিছুই নেই। রেন্টু একরকম পালিয়েছে। আসার পর থেকে তাকে মসজিদে নিয়ে যেয়ে সলাত পড়তে বাধ্য করেছে মেহেদী। প্রায় ৩/৪ ওয়াক্ত নামায পড়েছে রেন্টু। যে কাজ কোনো দিন করেনি মেহেদী তাকে দিয়ে সেই কাজ করিয়েছে। মসজিদে সলাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে সময় কাটাতে হবে আজ। কিন্তু এ এলাকার লোকজন খুবই কৌতুহলী। কোথাও একটু বিশ্রাম নিলেই,

আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? কোথায় যাচ্ছেন? ইত্যাদি প্রশ্ন করছে।

এসব খুবই বিরক্তি লাগে রেন্টুর। মানুষের প্রশ্নের হাত থেকে বাচার জন্য কেবল জোরে হাটতে থাকে। কোথাও দাড়ানো বা বসা যাবে না। সুযোগ পেলেই বিরক্তিকর জবাবদিহীতার মুখোমুখি হতে হবে।

প্রায় ঘন্টা খানিক রেন্টুকে বহন করে ক্লান্ত হয়ে গেছে পাদুটি। এখন একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়। চারিদিকে তাকিয়ে উপযুক্ত স্থান খুজতে থাকে। রাস্তার পাশেই দোকান পাশারী গুলোতে বসার মত স্থান আছে ঠিকই কিন্তু প্রতিটি দুকানে ১/২ জন লোক বসে রয়েছে। ওখানে বসবে না রেন্টু। হাতের কাছে পেলেই তাকে ঝামালেই ফেলে দেবে লোকগুলো। ঘন্টার পর ঘন্টা প্রশ্ন করে নাড়ি নক্ষত্রের খোজ খবর না নেওয়া পর্যন্ত ক্ষ্যান্ত হবে না তারা।

খুজতে খুজতে পড়ে থাকা বেশ কিছু গাছের গুড়ি দেখতে পায়। দুর থেকে ওগুলোকে বসার উপযুক্ত বলেই মনে হচ্ছে। আগপাছ না ভেবে সেদিকে এগিয়ে যায়। কাছে গিয়ে ক্লান্ত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষন করে গুড়ুগুলো। অল্প একটু যা ময়লা মাটি আছে তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু একফোটাও ছায়া নেই ওগুলোর উপর। মাথার উপর উত্তপ্ত সূর্য রেখে এখানে বসে বিশ্রাম নেওয়ার কোন মানেই হয়না। দোকানগুলোও এখন বেশ পিছনে। এসব ভাবতে ভাবতেই বসে পড়ে মোটা একটা কাঠের উপর। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে স্থানটি। এটি একটি ছমিল। এখানে কাঠ চেরাই করা হয়। পাশেই একটা কুড়েতে চোখ বুজে বসে রয়েছেন এক বৃদ্ধ। এই মিলটির সাথে তারা কোনো সম্পর্কে আছে অবশ্যই। হয়তো পাহারাদার নয়তো চেরাইকারী এসব ভাবতে ভাবতে বেশ কিছুক্ষন অতিবাহিত হয়ে যায়। কড়া রোদের ভিতর ঘামতে শুরু করেছে রেন্টু। এখানে আর একমুহুর্তও বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কিন্তু পায়ের উপর খাড়া হয়ে দাড়ানোর শক্তিও নেই। প্রায় ১০/১৫ মিনিট ওভাবেই বিশ্রাম নেয়।

চোখ খুলেই বেশ কিছুক্ষন ধরেই তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বৃদ্ধ ব্যাক্তিটি।

এই ছেলে রোদে বসে রয়েছো যে। এখানে এসে বসো। বলতে বলতে আবার ঝিমুতে থাকে লোকটি। বৃদ্ধের কথা শুনে প্রায় জ্ঞানহীন লোকের মত ছুটে যেয়ে কুড়ের ভিতর বসে পড়ে রেন্টু। লোকটি তখনও আধো ঘুমে আচ্ছন্ন। সে ঘুমিয়ে পড়ুক রেন্টু তাই চায়।

কয়েকটি বাঁশের খুটির উপর খড়ের চাল দিয়ে খুবই সাদামাটা ভাবে বানানো হয়েছে কুড়েটি। ভালো করে দেখলে বোঝা যায় একসময় বেড়াও ছিলো কিন্তু অবশিষ্ট কিছু কঞ্চি ছাড়া এখন আর কিছুই নেই কুড়েটির চারপাশে। বাতাস যেদিক থেকেই প্রবাহিত হোক কুড়েটি তা থেকে বঞ্চিত হবে না। তৃপ্তিকর ছায়া আর শীতল বাতাসে ঘুম এসে যাওয়ার উপক্রম হয় রেন্টুর। হঠাৎ ঘুমে বিরতি দিয়ে শব্দ করে নড়ে ওঠে বৃদ্ধটি। রেন্টুর চোখে চোখ পড়তেই মুচকি হাসেন। রেন্টুর মনে হলো কিছু একটা না বললে সৌজন্যতা রক্ষা হয় না। কিন্তু আকাশ পাতাল চিন্তা করেও বলার মত কোন কথা খুজে পায় না সে।

আপনি কি এই চেরাই মিলটির মালিক? তাড়াহুড়ো করে কথাটি বলে ঠিকই কিন্তু পরক্ষনেই বুঝতে পারে একে বেরেই বেমানান হয়েছে কথাটি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তিনি একজন হতদরিদ্র লোক। এ মিলটির মালিক নন। বরং একজন সামান্য কর্মচারী।

প্রশ্নটি শুনে কিছুক্ষন নিরব থাকে লোকটি। মনে হয় অপমান বোধ করছে।

আমারও অনেক কিছু ছিল.......। বলে শুরু করেন এক লম্বা কাহিনী। তার অর্ধশত বছরের উত্থান-পতনের কাহিনী। রেন্টুর অপছন্দ সত্বেও সে কাহিনী চলতে থাকে আধাঘন্টা ধরে।

তুমি কার বাড়ি এসেছ? একটু বিরতি নিয়ে প্রশ্ন করে বৃদ্ধ লোকটি।

মেহেদীদের বাড়ি। চরম বিরক্তির সাথে উত্তর দেয় রেন্টু।

লোকটি মেহেদীকে চিনতে পারে। মিনিট দশেক তার প্রশংসা করে।

তার কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় যেন প্রতিটি সেকেন্ড গননা করছে রেন্টু। ক্ষুধায় পেট চো চো করছে তার।

যা বলছিলাম বলে আবার নিজের জীবনী বর্ননা করতে শুরু করে পাহারাদার বৃদ্ধ। চোখ বুঝে ঘুম চেপে রেখে একানাগাড়ে বকে চলেছে লোকটি। ধৈর্যর বাঁধ ভেঙ্গে যায় রেন্টুর। তাকে কিছু না বলেই প্রস্থান করে। যখন কুড়েটি তার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেছে তখনও তার কথা শোনা যাচ্ছিল।

তার পর আমার বাবা সে বাগানটি বেচে ফেললেন। কত করে তাকে নিষেধ করলাম। পাড়া প্রতিবেশিরও অনেক বোঝালো। কিন্তু..................

রেন্টু আরও জোরে হাটতে থাকে।

কোথায় ছিলে বাবা। সেই কখন থেকে মেহেদী তোমাকে খুজে বেড়াচ্ছে। বলতে বলতে দ্রুত পায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যান রায়হানা বেগম।

প্রায় তখনই ফিরে আসে মেহেদী।

জোহরের সলাত পড়েছিস?

ঠিক এই জিনিসটির ভয়েই ৩ ঘন্টা পালিয়ে বেড়িয়েছে রেন্টু। অপরাধীর মত আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

যা এখনই ওযু করে সলাত পড়ে নে।

যাও বাবা আমি ভাত বাড়তে বাড়তে সলাত পড়ে ফেল। রান্নাঘর থেকে বলেন মেহেদীর মা।

প্রায় কেদে ফেলার মত অবস্থা হয় রেন্টুর।

এই যদি করতে হবে তবে এত কষ্টের কি দরকার ছিল।

এখন কি আর করা। বাধ্য হয়ে ওযু করে আসে। সলাতও পড়ে নেয়।

খাওয়া দাওয়ার পর ক্লান্ত শরীরে কৃষকরা যেমন গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ে তেমন ভাবেই বিছানায় এলিয়ে যায় রেন্টু।

প্রচন্ড মেধাবী ছাত্র রেন্টু। শুধু তার বাবা নয়, স্কুল-কলেজের স্যাররা পর্যন্ত তাকে নিয়ে গর্ব করে। বাবার কড়া শাসনের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই চলছিলো। হঠাৎ বদলে যায় চিত্র। ২২ বছরের একটা ছেলে যা করতে পারে তাই করে ফেলে সে। কলেজের একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়। মেয়েটি দেখতে ভালো ছিলো না। তবু তার সাথে মনের মিল হয়ে যায় রেন্টুর। সে প্রায়ই আসতো তাদের বাড়িতে। উভয়ের বাবা-মাও তাদের সম্পর্ককে মেনে নিয়েছিলেন। দেখতে ভালো না হলেও মেধাবী ছাত্রী ছিলো সে। যথা সময়ে রেন্টুদের বিবাহ হয়ে যাওয়াটা প্রায় নিশ্চিত ছিলো। কিন্তু হঠাৎ বেকে বসে মেয়েটি। রেন্টুর সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে বেছে নেয় অন্য এক ছেলেকে। সেই থেকে প্রায় পাগলের মত হয়ে যায় রেন্টু। বাবার শাসনের বাধ ভেঙ্গে পুরোপুরি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে। লেখা পড়া করে না বললেই চলে। রাত করে বাড়ি ফেরে। কোথায় থাকে কি করে প্রশ্ন করলে ভিষন রেগে যায়। এভাবে বেশি দিন চলতে থাকলে কোন না কোন মাদক দ্রব্যকে নিজের সঙ্গি বানিয়ে নেওয়াটাও অসম্ভব নয়। দুএকবার তো সেসবের কাছাকাছি পৌঁছেই গিয়েছিল। কিন্তু স্বভাবজাত লজ্জা তাকে ফরিয়ে এনেছে। রাতে কোন রকম ভুমিকা ছাড়াই মাহেদীকে একান্তে শোনায় মনের কথাগুলো।

মেহেদী ওর দিকে ফিরে তাকায়। সে বুঝতে পেরেছে কি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আছে তার মামাতো ভাইটি।

তুই যা করেছিস তাতো পাপ। আমি এমন এক মেয়েকে ভালোবাসি যার সাথে প্রেম করা পাপ নয়। সৌন্দর্যেও তোকে রেখে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটির থেকে হাজারগুন শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর রসুল (সঃ) বলেন, যদি জান্নাতের কোন মেয়ে উকি মারতো তবে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে তা আলোকিত হয়ে যেত এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান সুগন্ধিতে ভরে যেত। আর তার মাথার উপর যে ওড়নাটি থাকবে সমস্ত দুনিয়া বেচলেও তার দাম হবে না।

কোরআনে বলা হয়েছে তারা লুকানো মুক্তার মত।

সর্বনিম্ম জান্নাতিকে ৮০ হাজার খাদিম ও ৭২ জন স্ত্রী দেওয়া হবে।

একটি হাদিসে এসেছে, একজন জান্নাতি নির্জনে চিন্তামগ্ন থাকবে। হঠাৎ পিছন থেকে কেউ একজন তার কাধে হাত দেবে। সে তাকিয়ে দেখবে একটি অতীব সুন্দরী মেয়ে। তার চোয়ালে আয়নার মত নিজের মুখ দেখতে পাবে। মেয়েটি তাকে সালাম দেবে। উত্তর দিয়ে সে প্রশ্ন করবে, তুমি কে? সে বলবে আমি অতিরিক্ত। অর্থাৎ তোমাকে যে ৭২ টি স্ত্রী দেওয়া হয়েছে আমি তার বাইরে। নির্জন স্থানে একজন অপরিচিত মেয়ের স্পর্ষে কেমন অনুভুতি হতে পারে।

সেসব মেয়েরা হবে অসম্ভব লাজুক। যেন স্পর্ষ করলে লজ্জাবতী গাছের মত চুপসে যাবে। তার সর্বদা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে। স্বামীকে সন্তুষ্ট করার মত সমস্ত গুন দিয়েই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

খুবই সুরেলা কন্ঠে গান গাইবে সেসব অনন্ত যৌবনা কুমারিরা। তাদের প্রেমিককে কখনও কষ্ট পেতে হবেনা।

মেহেদীর কথায় রেন্টুর মন যেন আন্দোলিত হয়ে যায়। তাকে একটা নিরস কাঠের মতই মনে হয়েছিল রেন্টুর। এখন সে ধারনা ভুল প্রমানিত হলো। মেহেদীর মধ্যেও প্রেম আছে। ভালোবাসা আছে। সে জান্নাতের রাজকুমারীদের নিয়ে স্বপ্নে বিভোর। কত পবিত্র এ প্রেম! কত মহান! অথচ রেন্টু আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাই নিয়েই ব্যস্ত। নিজের জীবনের

গতিকে পাল্টে ফেলে সেও। একমাসের মধ্যে পুরো বদলে যায় রেন্টু।

এক মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও রেন্টুকে বাড়ি ফিরতে না দেখে ছোটমামা চলে আসেন একদিন। রেন্টু তখন মসজিদে আছরের সলাতের পর মেহেদীর কাছে কোরআনের বাংলা অর্থ শুনছে। ছোটভাইকে উঠানে বসতে দিয়ে সলাত পড়ে নেন রায়হানা বেগম। পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যেও। পাচ ওয়াক্ত সলাত পড়েন। সকালে মেহেদীর কাছে অল্প কিছু কথা শোনেন। আগে রহীম সাহেবের কিনে আনা কাপড় তার পছন্দই হতো না। নিজে বাজারে যেয়ে কিনে আনতেন। মেহেদী কত বার নিষেধ করেছে। কিন্তু শোনেননি। এবার মৃত্যুর কথা স্মরন হয়েছে তার। মেহেদী যা বলে তাই করেন। প্রায়ই রহীম সাহেবকে বিপাকে ফেলেন তিনি। ফজরের আযান দিলে ডেকে দেন। ২১ ইঞ্চি রঙিন টিভিটি বেচে ফেলার জন্য পিড়াপিড়ি করেন। কিন্তু রহীম সাহেব বলেন,

দেশ বিদেশের খবর রাখার দরকার আছে না?

খবর ছাড়া অন্য সব কিছু দেখা নিষেধ। মাঝেমাঝে চুরি করে একটা গান শোনা বা একটা সিনেমা দেখার চেষ্টা করলেই রায়হানা বেগমের চড়া গলা শোনা যায়,

কি হচ্ছে?

প্রায় সাথে সাথেই টেলিভিশনটি বন্ধ করে দেন রহীম সাহেব। রেনুকে চটানো যাবে না। একবার চটে গেলে ৭/৮ দিন তোষামোদ করেও সম্পর্ক স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে না। খুব জেদী মেয়ে রেনু। বলতে গেলে একরকম জেলখানাতেই আছেন মেহেদীর বাবা। কিন্তু তিনি পূর্বের চেয়ে খুশি। এখন রায়হানা বেগম তার দেখাশোনা করেন। কোনো কথা বললেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করেন। মেহেদী বলেছে মেয়েদের জন্য স্বামীর আদেশ মান্য করা ফরয। তবে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে গেলে স্বামী বা বাবা কারও কথাই শোনা যাবে না। আর সংঘর্ষ নয় বরং পরিবারের পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টাই করছেন রহীম সাহেব।

রায়হান বেগমের সলাত পড়া শেষ হতে না হতেই রহীম সাহেব অফিস থেকে ফিরে আসেন। শ্যলকের সাথে সৌজন্য আলোচনার মাঝেমাঝে তাকাচ্ছের স্ত্রীর দিকে। তিনি নিশ্চিত সলাত শেষ করেই তাকে সলাত পড়ার আদেশ করবে রেনু। তার চেয়ে বরং নিজ থেকে পড়ে নেওয়ায় ভালো। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে তাড়াতাড়ি ওযু করে সলাতে দাড়িয়ে গেলেন তিনি।

সবকিছু দেখে ভেবাচেকা খেয়ে গেয়ে যায় মেহেদীর মামা। অবাক হয়ে আপু-দুলাভাইকে দেখতে লাগলেন তিনি।

সলাত শেষ করে একটি বিছানা পেতে তার উপর বসলেন মেহেদীর বাবা-মা। ছোটমামাও চেয়ার ছেড়ে বিছানায় অবস্থান গ্রহন করলেন। তাকে অবাক করে দিয়ে মেহেদীর ভূয়সী প্রশংসা শুরু করলেন রহীম সাহেব।

সারা গ্রামের লোক তাকে ভালোবাসে। চায়ের দোকানে রাস্তার মোড়ে এখন তাকে নিয়েই আলোচনা হয়। প্রায় প্রতি খুতবাতেই ইমাম সাহেব তার নাম বলেন। যেন গর্বে ফেটে পড়ছেন রহীম সাহেব।

তোমার আপু যেভাবে চাপাচাপি করছে তাতে আমিও খুব শীঘ্র মাওলানা হয়ে যেতে পারি। বুজেছো মন্টু? লম্বা জামা আর টুপি পরলে আমার কেমন লাগবে বলতো। বলে মন্টুর দিকে দৃষ্টি দেন তিনি।

মন্টু কিছু বলেনা। এ আলোচনা তার ভালো লাগছে না। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে ফেলার জন্য আপ্রান চেষ্টা করছেন কিন্তু সক্ষম হচ্ছেন না।

সেদিন আর রেন্টুর সাথে দেখা হলো না তার বাবার। মেহেদীর সাথে অনেক রাতে বাড়ি ফিরল সে। সকালে ঘুম থেকে উঠে রেন্টুকে দেখলেন মেঝেতে বসে মেহেদীর সাথে কুরআন পড়ছে। মেহেদী

আরবিতে সুর করে পড়ছে। আর রেন্টু বাংলাতে নিশব্দে পড়ছে। রেন্টুকে আরবীতে কুরআন পড়া শেখাননি তিনি। তার কেন জানি লজ্জা বোধ হয়। যদি মেহেদীর মত রেন্টু দুলে দুলে আরবীতে কুরআন পড়তে পারতো তাহলে কত ভালো হত!

রেন্টুকে ডেকে দুএকটা কড়া কথা শুনিয়ে দেওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেরকম করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বড় একটা আঘাত পেয়ে ছেলেটি প্রায় উদভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলো। মেহেদীর কাছে এসে সে প্রশান্তি পেয়েছে। তার অস্থির মন স্থির হয়েছে। ছেলেটিকে আবার উত্তক্ত করাটা চরম বোকামী হবে। মন্টু মিয়া চুপ থাকেন। কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই মেনে নেন রেন্টুর এই পরিবর্তন। তিনি হেরে গেছেন। মেহেদী তাকে আবার পরাজিত করেছে। সে এবার তার ঘরে আক্রমন করেছে। তিনি এ যুদ্ধে নিরব দর্শকের ভূমিকা রাখা ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখছেন না।

জুমআর ছলাতের সময় একটু দেরি করেই মসজিদে পৌঁছালেন রহীম সাহেব। অন্যান্য দিন আর একটু আগেই আসেন। মন্টুকে সাথে নিয়ে আসতে যেয়ে দেরি হয়ে গেছে।

আজ মুজাফফর হুজুর অনুপস্থিত রয়েছেন। জুমআর ছলাত পড়ানোর দায়িত্ব মেহেদীর উপর দিয়ে তিনি কোথাও বেড়াতে গেছেন। মেহেদী বাংলাতে বক্তব্য রাখছে। প্রায় শ তিনেক লোক শুনছে তার কথা। এমনিতে খুব কঠোর মনের হলেও খুব মায়াভরা কন্ঠে মানুষকে জাহান্নামের ভয় দেখাচ্ছে মেহেদী।

(নিশ্চয় যাক্কুম গাছ পাপীদের খাবার। গলন্ত লোহার মত উত্তপ্ত পেটের ভিতর গরম পানির মত টগবগ করে ফুটবে। তাকে ধরে নিয়ে যাও, তাকে টেনে হেচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাও। তারপর তার মাথার উপর গরম পানি ঢেলে দাও। এ শাস্তি ভোগ কর। তুমি তো নিজেকে সম্মানিত মনে করতে। তুমি যে সত্য প্রত্যাক্ষান করেছিল। এটি তারই বিনিময়। যারা মুত্তাকী তারা থাকবে ঝরনা বিশিষ্ট জান্নাত সমুহতে। তারা সেখানে সুনদুস ও ইস্তাবরাকের দামী পোশাক পরে মুখোমুখি বসে থাকবে। এভাবে আমি তাদের টানা টানা চোখ বিশিষ্ট হুরদের সাথে বিবাহ পড়িয়ে দেব। তারা সেখানে প্রথম মৃত্যুর পর আর মৃত্যুবরন করবে না। আর তাদের রব তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।)

১৪ টি আয়াত একটানা আরবীতে মুখস্থ পড়ে। তারপর বাংলা করে দিতেই এর ওর মুখের দিকে তাকাতে থাকে মুছল্লিরা। প্রচন্ড গর্ব অনুভব করেন মেহেদীর বাবা।

ছোটমামা রেন্টুকে নিয়ে যেতেই এসেছিলেন। কিন্তু সে যেতে নারাজ। তাকে রেখেই চলে যান তিনি। দু-এক সপ্তাহ পর রেন্টুও চলে যায়।

৫.

রেন্টু চলে যাওয়ার পর মাঝে মাঝই যোগাযোগ করতো। কখনও কখনও দু এক দিনের জন্য বেড়াতেও আসতো। একবার প্রচন্ড শীতের মধ্যে মেহেদীদের বাড়িতে বেড়াতে আসে রেন্টু। ততদিনে মেহেদীর অনুকরনে জোব্বা আর টুপি পরতে শুরু করেছে সে। প্রায় মেহেদীর সমান দাড়িও গজিয়েছে তার মুখে। তার বাবা অসহায়ের মত মেনে নিয়েছেন সবকিছুই। ছেলেকে ফিরানোর কোনো চেষ্টা করেননি তিনি। সেরকম কিছু করলে যে রেন্টুর সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপকার হবে না তা তিনি ভালো করেই জানতেন। রেন্টু আসার পর থেকে কোমলও নিয়মিত আসতে শুরু করে শিউলি তলায়। তিনজন একত্রে যখন মুজাফফর হুজুরের বাড়ি যায় তখন তিনি যে কি খুশি হন তাকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

আছরের সলাত প্রায়ই বাজারের মসজিদে পড়ে মেহেদী আর রেন্টু। কোমলও বেশ দুর থেকে ওখানে আসে মেহেদীদের সাথে দেখা করার জন্য। সলাত

পড়ে বেশিরভাগ সময় মুজফফর হুজুরের বাড়ি গিয়ে বসে ওরা। কখনও কখনও মসজিদেই বসে পড়ে। সেদিনও কোমল এসেছিল। মেহেদী বলল,

আজ সারা রাত আমাদের মসজিদে সলাত আর কোরআন পড়লে কেমন হয়?

প্রস্তাবটি সকলেরই পছন্দ হয়। তখনই বাড়ি চলে যায় কোমল। মাকে বলে আসতে হবে। মাগরিবের সময়ই হাজির হয়ে যাবে সে। মুজাফফর হুজুরকে বললে তিনিও খুশি হন। তারও খুব ইচ্ছা হচ্ছে মেহেদীদের সাথে থাকতে কিন্তু তিনি বয়স্ক মানুষ। সারা রাত থাকতে পারবেন না। তিনি ফজরের সলাতের ঘন্টা খানেক আগে আসবেন।

এশার সলাতের পর বেশ কিছুক্ষন নফল ইবাদত করে একটু জিড়িয়ে নেওয়ার জন্য মেঝের উপরই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে তিন জন। কোমল আর রেন্টু গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। মেহেদীও ঘুমিয়েছিল কিন্তু এক ঘন্টা অতিবাহিত হতে না হতেই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কাউকে না জাগিয়ে মসজিদের এক কোনে নিশব্দে কোরআন পড়তে শুরু করে সে। একা একা কুরআন তেলাওয়াত করলে একটু বেশিই মজা পাওয়া যায়। হঠাৎ একটা কিছু পড়ার শব্দ কানে আসে। কৌতুহলী মনে মাথাটা উচু করে চারপাশ দেখতে থাকে মেহেদী। কোনো কিছু আচ করতে পারে না। শব্দটি হওয়ার পর আবার পূর্বের মত নিরব হয়ে গেছে পরিবেশ। শব্দটিকে কেন যেন ভুতুড়ে মনে হয় মেহেদীর কাছে। ভূত দেখে ভয় পায় না মেহেদী। ছোটবেলই দাদ-দাদীরা জীন পরীদের গল্প শোনাতো। মেহেদী সেসবকে গল্পই মনে করতো। কিন্তু কোরআন পড়ার পর সে জানতে পেরেছে জীন আল্লাহরই অন্য এক সৃষ্টি। এখন সে জিনের অস্তত্বে বিশ্বাস করে কিন্তু জিনকে ভয় পায় না। আল্লাহর হুকুম ছাড়া তার কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা জীনদের নেই। এসব ভাবতে ভাবতে পড়ায় মনোযোগ দেওয়ার জন্য মাথা নিচু করতেই হুপ করে কে যেন ঢুকে পড়ে মসজিদের মধ্যে। কোনো কিছু বোঝে ওঠার আগেই,

আমাকে রক্ষা কর উস্তাদ......... বলতে বলতে কাদো কাদো হয়ে যায় লোকটি।

কোরআন শরীফটি বন্ধ করতে করতে লোকটিকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করে মেহেদী। একটা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। সেই কাপড় ভেদ করে কোন ক্রমেই তাকে চেনা যাচ্ছেনা। তবে তার কণ্ঠস্বর খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে।

মেহেদী তাকে চিনতে পারছে না দেখে আগন্তুক দ্রুত বলে ওঠে,

আমি ঠান্ডু। পুলিশ আমাকে তাড়া করেছে। তুমি আমাকে রক্ষা কর উস্তাদ।

সেই ঘটনার পর থেকে ঠান্ডুর সাথে প্রায়ই দেখা হতো কলেজে। মেহেদী তাকে সলাত পড়তে বলতো, কোরআনের বাংলা অনুবাদ পড়তে বলতো। অনেক বইও তাকে দিত। সেগুলো পড়ে আবার তাকে ফিরিয়ে দিত সে। ঠান্ডু অনেক পাল্টিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার চঞ্চল মন তাকে পাপ কাজের সাথে জড়িয়ে রাখে। চুরি,ডাকাতি,রাহাজানী ইত্যাদি কাজের সাথে সম্পৃক্ততার কথা প্রায়ই মেহেদীর কানে আসতো। তারপর বেশ কিছু দিন তার সাথে দেখা সাক্ষাত হয়নি তাদের। হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি মেহেদী। ঠান্ডু সেদিন মেহেদীর পক্ষ হয়ে শাহনুর স্যারকে মারতে পর্যন্ত গিয়েছিল। সেকথা মনে পড়ে মাহেদীর মন খুব নরম হয়ে যায়। অন্য কোনো ব্যাপার হলে তাকে অবশ্যই সাহায্য করতো কিন্তু সে অপরাধী। একজন অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়ার মত হীন কাজ মেহেদী করতে পারে না।

তুমি অপরাধ করেছ। তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে। আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে পারব না।

ওর কথা শুনে যেন কুল কিনারা হারিয়ে ফেলে ঠান্ডু। কোনো বিরতি না দিয়েই বলে ওঠে,

মনে করো আমি চোর। আমার উপযুক্ত শাস্তি কি?

আল্লাহ বলেছেন চোরের হাত কেটে দিতে। একথা সুরা মায়েদার ৩৮ নং আয়াতে আছে।

মেহেদীর উত্তর তার পক্ষে গেছে এমন ভাব দেখিয়ে ঠান্ডু আবার প্রশ্ন করে,

আমি যদি জিনা করে থাকি তবে আমার উপযুক্ত শাস্তি কি?

সুরা নুরের ২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, জিনাকারী অবিবাহিত হলে তাকে ১০০ বেত মারতে হবে। বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে মেরে ফেলতে হবে। এটাকে ইসলামের পরিভাষায় রজম বলা হয়।

আমি অপরাধ করেছি। আমি পাপি। কিন্তু সে পাপের শাস্তি পাওয়ার জন্য তুমি আমাকে যাদের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছো তারা কি আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করবে? তারা তো আমার উপর নিজেদের তৈরী করা আইন প্রয়োগ করবে। তার হয়তো আমাকে জেল দেবে অথবা জরামানা করবে। তুমি কি মনে করো এটা আমার উপযুক্ত শাস্তি হবে? তারা যে মানুষের তৈরী আইন দিয়ে বিচার করে এটা কি অন্যায় নয়? তুমি আমাকে অন্যায় কাজে সাহায্য করবে না এটা আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু আমাকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তুমি কি তাদের অন্যায় কাজে সাহায্য করতে চাও? তারা যে আমাকে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইন দিয়ে বিচার করবে তুমি কি সে অপরাধে অংশিদার হতে চাও? কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে ঠান্ডু যেন যে কোনো মুহুর্তে পুলিশ হাজির হয়ে যাওয়ার ভয় হচ্ছে তার।

ঠান্ডু জিতে গেছে। ঠান্ডুর কথায় মেহেদীর কঠিন হৃদয় গলে গেছে।

তাই তো! ঠান্ডু নিশ্চিত অপরাধ করেছে। সে চুরি করেছে বা ছিনতায় করেছে বা অন্য কোন মারাত্মক অপরাধ করেছে। সে অপরাধের শাস্তি তো আল্লাহর দেখানো পথেই হওয়া দরকার। আল্লাহ যে অপরাধের জন্য যে শাস্তি ঠিক করে দিয়েছেন সেটিই উপযুক্ত শাস্তি। সেটি ছাড়া অন্য যে আইন দিয়েই বিচার করা হোক তা অন্যায়। চরম অন্যায়। চুরি করলে বা জিনা করলে পাপ হয় কিন্তু এগুলো কুফরী নয়। কিন্তু আল্লাহ সুরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতে বলেছেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না সে কাফির। মেহেদী যেমন ঠান্ডুকে চুরি করতে সাহায্য করেনি তেমনি পুলিশদের এ অন্যায় কর্মেও সাহায্য করবে না। মনে মনে চুড়ান্ত সাদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

তুমি কোথায় লুকাবে তা আমি বলতে পারব না। আবার পুলিশকেও কোনো তথ্য দিয়ে সাহায্য করব না। তোমরা উভয় পক্ষই অপরাধী। তোমাদের কাউকে আমি সাহায্য করব না। মেহেদীর কথা শেষ হতে না হতেই ঠান্ডু দ্রুত উঠে গেল। কিছুক্ষন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরাঘুরি করে আত্মগোপন করার মত নিরাপদ স্থান খুজতে লাগল। একবার ঘুমন্ত লোকগুলোর চাদরের মধ্যে ঢুকে পড়তে ইচ্ছা হলো। কিন্তু সেটা ভালো মনে হলো না।

মসজিদের মিম্বরটি কঠের তৈরী। ভিতরে একজন মানুষ বসে থাকার মত স্থান আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ঠান্ডু ব্যাপার টি বুঝতে পারবে না। সব মসজিদের মিম্বর তো ইটের তৈরী হয়। সেগুলোর ভিতরে সামান্যতমও ফাকা স্থান থাকে না। ঠান্ডু কিভাবে জানবে যে এই মসজিদের মিম্বরটি কাঠের তৈরী। তাছাড়া চারিদিক থেকে মিম্বরটি কাপড় দিয়ে ঢাকা। আগে থেকে জানে না এমন কেউ ব্যাপারটি কল্পনাও করতে পারবে না। ঠান্ডকে যদি মেহেদী একবার ব্যাপারটি বলে দিত তাহলে সে এ যাত্রা প্রানে বেচে যেতো। কিন্তু সে বলবে না। এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ৭/৮ জন লোকের পায়ের শব্দ শোনা যায়। তড়িঘড়ি করে ঠান্ডু মিম্বরটির পিছনে লুকিয়ে পড়ে। তখনও মিম্বরের ভিতরে ঢোকার চিন্তা ঠান্ডুর মাথায় আসেনি।

ইমাম সাহেব .... ইমাম সাহেব.............. অভদ্রের মত চিৎকার করতে থাকে পুলিশগুলো।

মেহেদী মৃদু শব্দে একমনে কোরআন পড়ছে। পুলিশের ডাকে সাড়া দিলেই বিপদ ঘটে যাবে। হয় মিথ্যা বলতে হবে নয় ঠান্ডুকে ধরিয়ে দিতে হবে। দুটোর একটাও করবে না মেহেদী।

খাদেম সাহেব মসজিদের পাশে ইমাম সাহেবের থাকার জন্য নির্মিত একটি ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। চিৎকার চেচামেচি শুনে তার ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে এসে ৭/৮ জন পুলিশ দেখে একটু অবাকই হলেন।

আপনাদের কি দরকার? এখানে কি জন্য এসেছেন?

আমারা একটা চোর খুজছি।

চোর খুজছেন? তাও আবার মসজিদে! বলে বেশ জোরে হেসে ওঠেন খাদেম সাহেব। তিনি ঘটনা জানেন না।

আমি ঘুমাচ্ছিলাম আর ছেলেটি কুরআন পড়ছে। আমরা কেউই চোর-ডাকাত সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না। আপনাদেরকেই খুজে দেখতে হবে। শরীর পাক-পবিত্র আছে এমন কেউ একজন মসজিদের ভিতরে ডুকে দেখে আসুন। কেউ থাকলে থাকতেউ পারে বলে কৌতুকের দৃষ্টিতে পুলিশগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি।

পুলিশগুলো একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে থাকে। যেন তারা নিশ্চিত নয় যে তাদের শরীর পবিত্র আছে কি না।

আপনারা সলাত পড়েন?

খাদেম সাহেবের প্রশ্নের কেউ উত্তর দেয় না। বোঝা যাচ্ছে আসলে তারা কেউই সলাম পড়ে না।

আপনারা মুসলিম না হিন্দু? ভীষন রেগে প্রশ্ন করেন খাদেম সাহেব। সলাত পড়ে না এমন লোক তার দুচোখের বিষ। তিনি বলেন মুসলিমের ছেলে হয়ে সলাত পড়বে না তবে কি মুর্তিপুজা করবে। তার সাথে যখন যখন বিয়ে হয় তখন পরীবিবির বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর। ঐ বয়সেও সলাত না পড়লে তিনি পরীবিবিকে ভীষন বকতেন। একদিন তো লাঠি দিয়ে মেরেও দিয়েছিলেন। রাগ করে পরীবিবি চলে যান তার বাবার বাড়ি। তার বাবা তখন মাঠ থেকে বাড়ি এসে জোহরের সলাত পড়ার জন্য ওযু করছিলেন। পরীবিবি কিছু বলার আগেই,

এই! একা একা জামাই বাড়ি থেকে চলে এসছিস? বলতে বলতে পানির পাত্রটি ছুড়ে মারেন তার দিকে। পাত্রটি আঘাত করে পরীবিবির পায়। এখনও সে আঘাতের চিহ্ন পরিষ্কার বোঝা যায়।

সেদিনই খাদিম সাহেব খোজখবর নেওয়ার জন্য চলে যান শশুর বাড়ি। পরীবিবি তাকে নির্জনে ডেকে বলেন,আমি যে সলাত পড়ে না একথা যেন বাবাকে বলবেন না। তাহলে মেরে ফেলবে আমাকে। খাদেম সাহেব তার কথা রাখেন। শশুরকে কিছুই বলেননি। তবে পরীবিবির কাছে ওয়াদা নিয়ে নিয়েছিলেন যে আর কখনও সলাত ত্যাগ করবে না।

এই দাড়িবিহীন বেনামাযী পুলিশগুলোকে দেখে ভীষন ঘৃনা হচ্ছে খাদেম সাহেবের।

শীঘ্র যান। ওযু করে সলাত পড়ে নেন। বলতে বলতে ডান পাশের পুকুরটির দিকে হাত দিয়ে ইশারা করেন। পুকুরটি ছাড়া পানির অন্য কোন ব্যবস্থা নেই।

মোটা জামা খুলে ফেলে ওযু করে আসে সবাই। শীতের প্রকোপে বানরের মত ঠক ঠক করে কাপতে থাকে তারা।

তাদেরকে সলাত পড়তে বলে আবার ঘুমোতে চলে যান খাদিম সাহেব। যাওয়ার সময় বলে যান মসজিদের দরজা খোলাই রয়েছে। ইচ্ছামত খোজ করে দেখুন। চোর-ডাকাত পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু আমাকে ঘুম থেকে তুলবেন না। ছেলেটির কোরআন তেলাওয়াতেও কোনো বাঁধা সৃষ্টি করবেন না।

পুলিশগুলো একযোগে সলাত পড়ছিল। আলতো তাকিয়ে দেখে আড়চোখে একে অপরের অনুকরন করছিল তারা। কেউ কেউ অত রাগ-ঢাক না করে সরাসরি ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের জনের সলাত দেখে নিচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছে সলাত পড়তে তারা সবাই সমান পারদর্শী। খাদেম সাহেব ঘুমোতে চলে গিয়েছিলেন। যদি তিনি এসব দেখতেন তাহলে পুলিশগুলোকে ঘাড় ধরে বের করে দিতের মসজিদ থেকে।

সলাত শেষ করে চোরটির খোজে মসজিদে ঢোকার সাথে সাথেই চাদরমুড়ি দেওয়া দুজন ব্যাক্তিকে শুয়ে থাকতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল পুলিশগুলো। এই শীতের রাতে চোর ছাড়া অন্য কেই বা চাদরমুড়ি দিয়ে এখানে পড়ে থাকবে। কিন্তু চোর তো একজন। আর এখানে শুয়ে আছে দুজন। এতসব না ভেবেই সবাই ঘিরে ধরল কোমল আর রেন্টুকে। একজন একটু সাহস করে চাদর ধরে টানতেই ঘুম ভেঙে গেল দুজনের। অতগুলো লোক তাদের ঘিরে রয়েছে দেখে কোনো কিছু বোঝার চেষ্টা না করেই বিকট চিৎকার করে ওঠে তারা। তাদের চিৎকার শুনে আবার ঘুম ভেঙে যায় খাদেম সাহেবের। তিনি বের হয়ে এসে যখন সবকিছু শুনলেন ভীষন রেগে গেলেন। কান্ডজ্ঞানহীন লোকগুলোকে ভীষন অপমান করলেন তিনি। বললেন যা দেখার দেখে দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে যান।

এখানে কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে বলতে বলতে মিম্বারটির দিকে এগিয়ে যায় একজন। মেহেদীর বুকের ভিতর ধপ করে শব্দ করে হয়। আর কেউ না জানলেও মেহেদী তো জানে চোরটি কোথায়। পুলিশটি মিম্বরের পিছনে দৃষ্টি দিতেই মেহেদীর মনে হলো এখনই ঠান্ডুকে টেনে হেচড়ে বের করে আনবে লোকটি। ওকে অবাক করে দিয়ে পুলিশটি খালি খালি ফিরে আসলো।

পুলিশগুলো যখন খাদেম চাচার সাথে কথা বলছিল তখনই ঠান্ডু বুঝে ফেলে মিম্বারটি কাঠের তৈরী। খুবই সতর্কতার সাথে নিঃশব্দে ওটির ভিতরে ঢুকে পড়ে। অন্য কেউ তো নয়ই মেহেদীও ব্যাপারটি টের পায় নি।

এর মধ্যে হাজির হয়ে যান মুজাফফর হুজুর। মসজিদের ভিতর ওতগুলো পুলিশ দেখে চোখ কপালে উঠে যায় তার। তিনি পুলিশদের খুব ঘৃনার চোখে দেখেন। বলেন এদের তৈরীই করা হয় কাফের নেতাদের দাসত্ব করার জন্য। আল্লাদ্রোহী নেতা-নেত্রীদের আদেশে এরা ইসলামের উপর আঘাত হানতেও দ্বিধা করে না।

আপনারা মসজিদে কেন? এমন ভাবে প্রশ্নটি করলেন যেন পুলিশদের মসজিদে প্রবেশ করারই অধিকার নেই।

আমরা একটি চোরকে খুজছি হুজুর।

এখানে চোর খুজছেন? ভীষন বিরক্ত হন মুজাফফর হুজুর।

আপনাদের পোশাক ও শরীর পাক-পবিত্র আছে তো?

জি হ্যাঁ। আমরা ওযু করেছি। সলাতও পড়েছি।

তাই নাকি! তাহলে তো অনেক কাজ করে ফেলেছেন। এখন যান।

ইমাম সাহেবের কথা শুনে বিদায় নেয় পুলিশগুলো।

অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিক হলে হুজুরকে সব কিছু খুলে বলে মেহেদী। সব শুনে তিনি বললেন ঠিকই করেছো। একজন মানুষ সে যত বড় অপরাধীই হোক তাকে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইন দিয়ে বিচার করা চরম অন্যায়। আমরা যেমন চুরি করার বিরুদ্ধে তেমনি চোরকে মনগড়া আইন-কানুন দিয়ে বিচার করারও বিরুদ্ধে।

অনেকক্ষন কাঠের মিম্বারের মধ্য থেকে দম বন্ধ হয়ে যায় ঠান্ডুর। পুলিশগুলো বিদায় নেওয়ার বেশ

কিছুক্ষণ পর মিম্বারটি উচু করে মাথা অর্ধেক বের করতেই মুজাফফর হুজুরকে দেখে আবার ভিতরে ঢুকে পড়ে সে।

ভয় নেই বেরিয়ে এস। ইনি আমাদের ইমাম সাহেব।

ঠান্ডু বের হয়ে আসলে তাকে অনেক করে বোঝালেন মুজাফফর হুজুর। বললেন তুমি তাওবা করো। আল্লাহ তোমার সব পাপ মাফ করে দেবেন।

আমি তাওবাই করতে চাই হুজুর। আমি আমার পূর্বের জীবন থেকে ফিরে আসতে চাই। কিন্তু এটা নিয়ে কি করব বলতে বলতে পকেট থেকে একটি দামী রিভলবল বের করে ঠান্ডু।

এটা আমি পুলিশের কাছে জমা দেব নাকি নষ্ট করে ফেলব?

ঠান্ডুর হাত থেকে অস্ত্রটি নিতে নিতে হজুর বলেন, এত দিন তুমি এটি পুলিশের হাতে জমা দাওনি কেন?

তখনতো পুলিশ আমার শত্রু ছিল। পুলিশ এখনও তোমার শত্রু। ওরা কাফিরদের আনুগত্য করে। কাফিররা যতটুকু ইসলাম মানার অনুমতি দেয় ততটুকু মানলে ওরা তোমাকে কিছুই বলবে না। কিন্তু আল্লাহর রসুলের রেখে যাওয়া ইসলামের পুরোপুরি মানলে ওরা তোমাকে আগের চেয়ে বেশি খুজে বেড়াবে। এসকল জাহান্নামের কিটরা শক্তির বলে আল্লাহর আইনকে পিছনে ঠেলে দিয়ে কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। যদি আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে মুসলিমদেরও শক্তি অর্জন করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

তোমারা তাদের উদ্দেশ্যে শক্তি এবং প্রস্তুত ঘোড়া সংগ্রহ কর। যা দিয়ে তোমরা ভয় প্রদর্শন করবে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে। (সুরা আনফাল-৬০)

মাওলানা খোদা বকশ এবং তার সাঙ্গ পাঙ্গদের মত গনতান্ত্রিক পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আপনি কেমন মনে করেন? হুজুরের কথার মাঝে প্রশ্ন করে ঠান্ডু।

তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্ট। কারন তারা কাফিরদের তৈরী গনতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে। যে পার্লামেন্ট তৈরী হয়েছে আইন তৈরী করার জন্য তারা সে পার্লামেন্টকে মেনে নিয়েছে। আল্লাহ কোরআনের ভিতর কোন অপরাধের কি শাস্তি তা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দেওয়ার সত্বেও নতুন করে আইন তৈরী করার জন্য পার্লামেন্ট তৈরী করা শিরক। যারা এই পার্লামেন্টকে মেনে নেবে তাদের একাজ চরম ঘৃনিত। তাছাড়া আল্লাহ স্পষ্ট করেই বলেছেন,

তুমি চাইলেও বেশিরভাগ লোক মুমিন হবে না। (সুরা ইউসুফ-১০৩)

চিরকালই ইসলামের পক্ষের দল সংখ্যায় কম ছিলো। যদি বেশিরভাগ লোকের ভোটের জন্য অপেক্ষা করা হয় তবে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে না। বরং আমাদের দেখতে হবে কিভাবে কম সংখ্যক লোকের মাধ্যমে বেশিরভাগ কাফিরকে পরাজিত করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায়। আল্লাহ বলেন,

যখন তালুত সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হল তখন সে বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের একটা নদী দিয়ে পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা থেকে পান করবে সে আমার দলের কেউ নয়। আর যে পান করবে না সে আমার লোক। তবে এক অঞ্জলী পান করা যেতে পারে। তারপর যখন তারা সে নদী পার হল তখন মুমিনরা বলল আমরা আজ জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে পেরে উঠব না(কারন তারা সংখ্যায় বেশি ছিলো)। যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা বলল, কত ছোট দল কত বড় দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। (সুরা বাকারা- ২৪৯)

সেদিন সত্যি সত্যিই মুমিনরা সংখ্যায় কম হওয়া সত্বেও জয়ী হয়েছিলো। একই ভাবে বদরের যুদ্ধে ১০০০ জন কাফিরের বিরুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম

জয়ী হয়েছিলো। যদি মুসলিমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে যা আছে তাই নিয়ে কাফিরদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত তবে আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ বলেন,

কাফিরর তোমাদের আল্লাহর থেকেও বেশি ভয় করে। কারন তার জানে না। (সুরা হাশর-১৩)

আর যদি অস্ত্র বর্জন করে কাফিরদের দেখানো পথে বেশিরভাগ লোকের ভোট অর্জনের চেষ্টাতে জীবনপাত তবে তাদের দুনিয়া আখেরাত নষ্ট হবে। আল্লাহ বলেন,

কাফিররা চায় তোমরা অস্ত্র সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়। যাতে করে তারা তোমাদের উপর একযোগে হামলা করতে পারে। (সুরা নিসা-১০২)

যারা কাফিরদের সাথে আপোষ করে অস্ত্র বর্জন করে ভোটা-ভুটির মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলছে এরা আসলে কাফিরদের সে ইচ্ছাকেই পুরা করছে। অথচ আল্লাহ সুরা আনফালের ৬০ নং আয়াতে শক্তি অর্জনের কথা বলেছেন।

ঠান্ডুর কথার লম্বা উত্তর দেওয়ার পর হুজুর তাকালেন মেহেদীর দিকে। যেভাবে তোমরা নিজেদের জীবনকে পাল্টিয়ে ফেলেছো সেভাবে এই দেশের কুফরি ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে হবে। তোমাদের মত যুবকরাই পারবে এরকম কিছু একটা করতে। মৃত গাছ বৃষ্টি হওয়ার পর যেভাবে সজিব হয়ে ওঠে তোমাদের মত সচেতন যুবকের আল্লাহর উপর ভরসা করে কুফরী ব্যবস্থার সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হলে এ জমিনে একদিন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবেই। যদি তা নাও হয় তবু আখেরাতের দিন আল্লাহ নিশ্চয় তোমাদের সম্মানিত করবেন। তোমাদের সর্বোচ্চ জান্নাতে দাখিল করবেন। এটাই মহা সফলতা। আর যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে পিছনে ফেলে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যাও তবে হাশরের ময়দানে তোমাদের কঠিন জবাবদিহীতার মুখোমুখি হতে হবে।

সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে মুজাফফর হুজুরের কথা। নিশ্চয় তিনি খুব গুরুত্বপুর্ন বিষয়ে কথা বলছেন। তিনি আর দশজন ইমামের মত নন। তিনি ইসলামকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন। তিনি এই যুবকদের এক মহান কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। একদিন তার সে কর্মসুচী অবশ্যই বাস্তবায়ীত হবে। হয়তো তিনি তখন থাকবেন না। কিন্তু এ কাজ শুরু করার কারনে তার সুফল কবর থেকেই ভোগ করতে থাকবেন। তিনি এটাই চান।

সমাপ্ত

ولله الحمد والمنة

লেখকের অন্যান্য বই

*** গ্রন্থাবলী:**

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" বইয়ের জবাব)

*** রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):**

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

*** ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:**

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রর স্বরূপ উম্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩১. কল্পনায় জান্নাত (কবিতা গ্রন্থ)

*** ভাষা শিক্ষা:**

৩২. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩৩. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ) ২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)